ওঁ

নমো ভগবতে বিশ্বরূপায়।

# আহ্নিক ক্রিয়া

বা

## সংসারবাসী আত্মবিস্মৃত জীবের দৈনিক ও সাময়িক কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রচার।

চিন্তিতে সে চিন্তামণি নাহি কালাকাল,
শমন প্রতীক্ষা নাহি করিবে 'সে দিন'।
চিন্ত নিরন্তর তাঁ'রে', ঘুচাও জঞ্জাল,
জান কি, কখন্ মৃত্যু করিবে মলিন?

শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তি-দ্বারা বিরচিত

এবং

"শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়" হইতে
শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়-দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন,
কালিকা-যন্ত্রে
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-দ্বারা মুদ্রিত।

ফাল্গুন, ১৩০০ বঙ্গাব্দ।

মূল্য চারি আনা।

# আহ্নিক-ক্রিয়া-সম্বন্ধীয়

## অভিপ্রায়।

পরমার্থপ্রিয়, স্বধর্ম্মনিরত, ভক্তিভাজন,
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের
অভিপ্রায়-পত্র (দর্জ্জিপাড়া, ২৪এ চৈত্র ১২৯৪)।

আত্মান্বেষী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তীর রচিত 'আহ্নিক-ক্রিয়া' নামক পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পরিদর্শন করিয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমার বিবেচনায় ইহাদ্বারা আত্মানুসন্ধায়ী-ব্যক্তিগণ বিশেষ উপকার লাভ করিবেন। ইহার ভাব অতীব উচ্চ, কিন্তু ভাষা এত প্রাঞ্জল ও সুমধুর, যে ইহা প্রায় সকলেরই অল্লায়াস-বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা। পুস্তকখানির কলেবর যদিও নিতান্ত বৃহৎ নহে, কিন্তু ইহাতে সংসার, জীব, আত্মা প্রভৃতি উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ,—এবং আমাদের ন্যায় আত্মবিস্মৃত মোহান্ধ ব্যক্তিগণের প্রাতর্মধ্যাহ্নাদি ও বিপদ্, সম্পদ্, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতি সার্ব্বকালীন কর্ত্তব্য-সমূহ,—এমন বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে যে, ইহাকে একখানি বৃহদ্‌গ্রন্থের সমকক্ষ বলিলেও বলা যায়। এই পুস্তক-সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহা কোন শাস্ত্রাদির অনুকরণ না হইলেও কোন শাস্ত্র বা কোন সম্প্রদায়েরই বিরুদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ যাঁহারা হৃদয়ের সহিত এই পুস্তকের ভাব গ্রহণ-পূর্ব্বক পাঠ ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন, তাঁহাদের বিশেষ ফল লাভ হইবে সন্দেহ নাই। ইতি

সভাবাজার-রাজবাটী-নিবাসী, বিজ্ঞ-জন-সুপরিচিত,
ভগবৎ-প্রেমিক, শ্রদ্ধাভাজন, প্রাচীন পণ্ডিত,

## শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের
অভিপ্রায়-পত্র (৩০এ চৈত্র ১২৯৩ বঙ্গাব্দ)।

নির্ম্মলাত্মা পরমভাবুক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তি-মহাশয়, সুললিত বাঙ্গালা ভাষায় আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব ও সদাচারোপদেশ-সূচক কয়েকখানি মনোহর গ্রন্থ রূপকচ্ছলে রচনা করিয়া অনেকেরই অনুরাগভাজন হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাল-বশে সকলে ঐসমস্ত গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিতে পারিল না। সে যাহা-হউক, এক্ষণে চক্রবর্ত্তি-মহাশয় 'আহ্নিক ক্রিয়া' নামক যে এক-খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ইতিপূর্ব্ব-প্রণীত 'জীবন-পরীক্ষা'-নামক গ্রন্থের শিরোভাগস্বরূপ।

জীবন-পরীক্ষায় 'প্রকৃত তত্ত্ব কি?' 'মৃত্যু কি?' 'লোকের কর্ত্তব্য কি?' সর্ব্বদেশের এই সার্ব্বকালীন প্রশ্ন-ঘটিত কথা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। উপস্থিত ক্ষুদ্র গ্রন্থে 'লোকের কর্ত্তব্য কি?' এই শেষ প্রশ্নের বিশদ উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত, অর্থাৎ অহনি অহনি (প্রতিদিন), এবং সম্পদাপদ্-যৌবন বার্দ্ধক্যাদি প্রত্যেক অবস্থায়, আমাদের কর্ত্তব্য কি? তদ্বিষয় অতীব সু-প্রণালী-মতে ও সাধারণের অল্পায়াস-বোধগম্য করিয়া লিখিত এবং 'আহ্নিক-ক্রিয়া' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

অজ্ঞতাপ্রযুক্ত বর্ত্তমান সময়ে প্রায় অনেকেই ধর্ম্মশাস্ত্র-বিহিত আহ্নিক-ক্রিয়াকে অপ্রয়োজনীয় বোধে পরিত্যাগ করিয়া-ছেন। অবশিষ্ট কতিপয় লোকের মধ্যে অধিকাংশই, আহ্নিকের

উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, কেবল সংস্কৃত-শব্দ-বিন্যস্ত-মন্ত্রোচ্চারণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন দ্বারাই আহ্নিক-ক্রিয়া সাধন মনে করিয়া আপনাদের ধার্ম্মিকাভিমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই 'আহ্নিক-ক্রিয়া' নামক গ্রন্থ মানব-সমাজের, বিশেষতঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞ আত্মবিস্মৃত হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিগণের, উল্লিখিত বিশেষ অভাব দূরীকরণের উপযুক্ত বলিয়া আমাদের বোধ হয়।

'আহ্নিক-ক্রিয়া' হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ গ্রন্থ হয় নাই, অথচ লিখন চাতুর্য্য ও অভিনব কল্পনা দ্বারা ইহা যেন 'নূতন' বলিয়া প্রতীতি জন্মে। গ্রন্থকারের উপাসনা-ঘটিত কথা সকল যেন শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিবাক্যের প্রতিধ্বনি বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহারা ভগবৎ-পূজা-করণ-কালে আত্মজ্ঞানের ভাব-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে যেমন,—

> "ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে।
> ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্‌ভাবো হি কারণম্‌॥"

বলিয়া সর্ব্বভূতেই সমভক্তিভাবে ভগবান্‌কে পূজোপাসনাদি করিতেন, আহ্নিক-ক্রিয়ায়ও সেই ভাবের সদ্ভাব দেখা যায়। ফলতঃ এই গ্রন্থ পাঠ ও তদনুযায়ী কার্য্যাভ্যাস-দ্বারা লোকের মানসিক স্বচ্ছতা ও সত্বজ্ঞান-সোপান লাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। উৎকৃষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানের অধিকতর উৎকর্ষ, এবং নিকৃষ্টের উন্নতি সাধন, এই আহ্নিক-ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল।

---

## ইণ্ডিয়ান্ মিরার পত্রের অভিপ্রায়।

( ৩রা আগষ্ট ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। )

Ahnika-Kriya,—By Priya Nath Chakravarti. From the title of the book, one would be apt to suppose that it contains the set formulæ that are uttered by the pious Hindus at given portions of the day. But this is not so. The book consists of a series of essays on the duties and responsibilities of man at different stages of life and under the varied circumstances of one's worldly career. The essays are characterised by profound thoughtfulness, and pervaded by a deep vein of spirituality, all reflecting the highest credit on the head and heart of the writer. The treatise is, we understand, intended for gratuitous distribution.*

---

## সঞ্জীবনী-পত্রিকার অভিপ্রায়।

( ১৯এ শ্রাবণ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ। )

প্রিয়নাথ বাবু অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন; সকল গুলিই ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। আমরা তাঁহার 'আহ্নিক-ক্রিয়া' পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। যদি মাদৃশ মৃত ব্যক্তিবর্গ জীবন-হীন-ভাবে আহ্নিক না করিয়া প্রিয়বাবুর মত সজীব আহ্নিক করিতেন, তবে বাঙ্গালার জীবনে নূতন স্রোত বহিত। গ্রন্থের ভাষা সরল, মিষ্ট ও প্রাণ-স্পর্শী।

---

* The first edition was done so. (Publisher.)

# নিবেদন।

কিঞ্চিদূন সাত বৎসরের পর ভগবান্ বিশ্বরূপের কৃপায়, এবং তন্নামানুরক্ত ও মাতৃভাষাপ্রিয় ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ-সহায়তায়, আমাদের বড় আদরের 'আহ্নিক-ক্রিয়া' আবার মুদ্রিত ও সাধারণসমীপে প্রকাশিত হইল। এই আহ্নিক-ক্রিয়াই পূর্ব্ববারে গোবরডাঙ্গা-নিবাসী সদাশয় শ্রীযুক্ত হরিবিহারী সেন-প্রদত্ত অর্থদ্বারা প্রকাশিত, এবং তৎকর্ত্তৃকই ভগবদনুরক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিঃস্বার্থভাবে বিতরিত হইয়াছিল।

সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ, বেদোক্ত আহ্নিক-তত্ত্ব সম্যক্রূপে ধারণার অধিকারী, ভক্তিভাজন, 'ব্রাহ্মণ'-গণের, এরূপ আহ্নিক-ক্রিয়ায় কোন প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহারা, অনিত্যকামনাশূন্য মহাত্মা পূজ্যপাদ আর্য্য-ঋষিগণ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত যে অক্ষয় অমূল্য রত্নের অধিকার লাভ করিয়া আনন্দিত হইতে পারিয়াছেন, তাহার তুলনায় ইহা অতি তুচ্ছ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা কেবল আমাদের ন্যায় বৈধ-সংস্কার-বিহীন, পবিত্র সংস্কৃতভাষার রসানভিজ্ঞ, প্রণব গায়ত্র্যাদি বেদ-মন্ত্র-ধারণায় অশক্ত, ব্যক্তিবর্গের জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে। বড় আহ্লাদের কথা, এবং এই লেখকাভিমানীর পক্ষে বড়ই সৌভাগ্য ও শ্লাঘার বিষয় যে, ইহার মত কোন-কোন আত্মবিস্মৃত ব্যক্তি, এই (অনেকের বিবেচনায়) অকিঞ্চিৎকর বঙ্গভাষায় প্রকাশিত আহ্নিক-ক্রিয়ায় উক্ত ক্রিয়া-কলাপের যথাকালীন অনুষ্ঠান-দ্বারা তৃপ্তি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বপ্রকাশিত আহ্নিক-ক্রিয়ায় যে যে স্থলে ত্রুটি বোধ হইয়াছিল, এ সংস্করণে সেই সকল স্থল সাধ্যানুসারে শোধিত

হইল ; কিন্তু শোধন সঙ্গত হইল কিনা, হৃদয়বান্ আহ্নিক-ক্রিয়ার অনুষ্ঠায়িগণই তাহার নিরপেক্ষ বিচার-কর্ত্তা।

অবশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করা যাইতেছে যে, কলিকাতার পূর্ব্ব-দক্ষিণ, সহরতলীর অন্তর্গত, ঢাকুরিয়া-গ্রাম-নিবাসী, স্থানীয় মধ্য ইংরাজী 'বিদ্যালয়ের (মাইনর স্কুলের) প্রধান ইংরাজী শিক্ষক, প্রীতিভাজন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দাস মহাশয় পূর্ব্ব-প্রকাশিত আহ্নিক-ক্রিয়ার কতিপয় ত্রুটি-প্রদর্শন-দ্বারা উপকার করিয়াছেন ; এবং ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত শশিভূষণ কৃতিরত্ন মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কন-কালে ইহার আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এখন যাঁহাদের জন্য আহ্নিক-ক্রিয়া আবার নব-কলেবর প্রাপ্ত হইল, তাঁহাদের অন্তর-সংস্কারের কিঞ্চিন্মাত্র উপযোগী হইলেই অভিলাষ পূর্ণ হইবে। ইতি

জন্মভূমি, গোকর্ণী 'ভৈরব-নিবাস'
মগরাহাট পোষ্ট, ২৪ পরগণা।

সাধুচরণাবনত, আত্ম-বিস্মৃত

## সংশোধনী।

| পৃষ্ঠ | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ২ | ২২ | অবস্থার নাম | অবস্থা |
| ১৪ | ৯ | সাসাংসারিক | সাংসারিক |
| ৩০ | ২০ | মানন | মানব |
| ৩৬ | ২৪ | ৪৮ মিনিট | ২৪ মিনিট |
| ৪০ | ২৩ | আশায় আমরা | আশায় |
| ৪৪ | ৭ | বিরূদ্ধ | বিরুদ্ধ |
| ৫৪ | ২৪ | পরাহ্নে | সায়াহ্নে |
| ৬৫ | ১৪ | দূরীরকণার্থ | দূরীকরণার্থ |

# সূচনা।

কাল, আপনার সহিত এই বিশ্বমণ্ডলকে নিজ অবিরাম ঘূর্ণনশীল বিশালচক্রে বাঁধিয়া যে কেমন চমৎকারভাবে ঘুরিতেছেন, যিনি নিবিষ্টচিত্তে তাহা চিন্তা করিবার অবকাশ পান, তিনিই কেবল তাহার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হন। মাদৃশ চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির এই ব্যাপার বুঝিবার অধিকার নাই।

যাহা হউক, এই কাল, আপনার চমৎকার চক্রসহ অতি সূক্ষ্মতম অণু হইতে বিশাল বিশ্বপর্য্যন্ত সুশৃঙ্খলে বাঁধিয়া যেরূপে ঘুরিতেছেন, তাহা ধীরভাবে ভাবিতে পারিলে বুঝা যায়, এই ঘূর্ণন দ্বারাই সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংসাধিত হয়। যে সচ্চিন্তাশীল ব্যক্তি বিচার দ্বারা উক্ত চিন্তা-প্রসূত আনন্দজনক ভাবের আস্বাদ পান, তিনিই বুঝিতে পারেন. যে, অণুপলজাত দিন, বার, মাস, বৎসরাদিক্রমে 'কাল' প্রাণিময় জগতের সহিত মিলিয়া স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে কি বিশাল প্রদেশে বিরাজ করিতেছেন ; এবং প্রাণিগণকেও ( বাল্যযৌবনাদি অবস্থায় ) কেমন নূতন নূতন সাজে সাজাইতেছেন। ইতিমধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কাল যখন প্রাণিগণকে নিজ-চক্র-পরিধিতে ঘুরাইয়া শান্তিপূর্ণ আনন্দনগরে লইয়া যান, তখন তাহাদের আরাম লাভ হয় ; আবার যখন তাহাদিগকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে দুঃসহ দুঃখের জ্বালাপূর্ণ স্থানে লইয়া যান, তখনও তাহাদের আরাম লাভ হয়। স্থূলরূপে দেখিলে বোধ হয়, উহাদের মালিন্যশূন্য প্রাণের মহাশক্তিসঞ্জাত

'আরাম' যেন কোনকালেই উহাদিগকে ছাড়িতে পারে না। সেইজন্যই মানব-শরীর-ধারী প্রাণী ( অনেকের দৃষ্টিতে ) অতীব দূষিত সংসর্গ, অপেয় পান, এবং অভোজ্য ভোজন প্রভৃতি নিতান্ত কুৎসিত কার্য্যেও আরাম পায়। এরূপ দেখিয়া সহসা বোধ হয়, যেন আরাম-দেব উহাদের চিরসহচররূপে সদসৎ সর্ব্ব কার্য্যেই উহাদিগকে সুখ প্রদান করেন। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। যদি কোন ব্যক্তি ক্রমশঃ দয়ালু আরাম-দেবের নিতান্ত অনভিমত কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তিনিও উক্ত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিতে চাহেন ; এবং উত্তরোত্তর উক্তপ্রকার দুষ্টাচারের আধিক্য ঘটিলে অবশেষে যখন আরাম-দেব, উহাকে একবারে পরিত্যাগ করেন, তখনই ঐ দুরাচার-তৎপর ব্যক্তি, সংসারে আপনার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়কেই শূন্য ও নীরস দেখে ; এবং তৎকৃত ঐ সকল কার্য্যকেও পাপ-পূর্ণ ও ঘৃণার্হ বুঝিতে পারিয়া, যেখানে আরামের অবস্থিতির সম্ভাবনা বোধ করে, ব্যগ্রভাবে সেই দিকেই ধাবিত হয়। এই প্রকার ধাবনই মনুষ্যত্ব-প্রাপ্তির প্রথম সোপান।

দুষ্কৃতির ফলভোগের পর, এইরূপে মানব যখন আরামানুসন্ধানে ধাবিত, এবং ক্রমশঃ আরামবিরুদ্ধ সমস্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত, হইয়া কেবল আরামেরই সহবাস করিতে বাসনা করে, সেই সময় আরামও আত্মারাম অভীষ্টদেব ভগবানের রূপ ধারণ করিয়া আরামাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কামনা পরিপূর্ণ করেন। মানবের এই অবস্থার নাম আরামার্থিগণেরই বোধগম্য।

একদা যামিনীযোগে শয্যায় শয়ান অবস্থায় সৌভাগ্যক্রমে উল্লিখিত সত্য কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাগত হওয়ায়,

স্বপ্নাবেশে মূর্ত্তিমান্ 'কাল' বা সময়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। স্বপ্নযোগে তাঁহার যেরূপ আকৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এখন তাহা ভাষাদ্বারা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই। কেবল তাঁহার আরাম-বিরহ-প্রকাশক হাহাকার-ধ্বনি শুনিয়া, আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য বিষয়ক আলাপের পর, তিনিই দয়া করিয়া আমাকে বলিলেন,—"বৎস! তুমি যদি আমাকে আরামের কোন সন্ধান বা সংবাদ বলিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমাদ্বারাও তোমার অনেক উপকার হইতে পারে। এই মর্ত্ত্যধামে আমি অনেক দিন হইতে 'হা আরাম! হা আরাম!' করিয়া অবিরাম ভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু এখানে আমার এমন কোন সুহৃদ্ই দেখিতে পাই না, যে ব্যক্তি আমাকে আনন্দনিদান আরামের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে।"

ইতিপূর্ব্বে, কালের সহিত আমার আর কখনও কোনরূপে সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু শুনিয়াছিলাম; কালের সহিত সদ্ভাব রাখিতে পারিলে এই আপাত-ক্লেশময় সংসারেই 'নিত্যসুখ' লাভ করা যায়। সেই সুখের জন্যই, সময়কে পাইয়া তখন আমার আহ্লাদ হইলেও, তাঁহার ব্যথিত ভাব দেখিয়া চিত্ত চঞ্চল হইল। বলিলাম,—"আপনি যদি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকেন, তাহা হইলে আমি নির্ভয় হইয়া আপনার জন্য প্রাণ পণে আরাম-দেবের অনুসন্ধানার্থ চেষ্টা করি।"

এই কথায় 'কাল' ঈষৎ হাসিয়া আমাকে বলিলেন,—"বৎস! আমি ত সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে আছি; আমি না থাকিলে তোমার অস্তিত্বই থাকিতে পারিত না। তোমার অতীব প্রিয় জীবন, আর কিছুই নহে—আমারই অতি সূক্ষ্ম

অংশ—কতকগুলি অণুপলের সমষ্টি মাত্র। সেই অণুপলগুলিই সর্ব্বদা তোমার হৃদয়মধ্যে ধক্ ধক্ শব্দ করিয়া তোমাকে আমার অস্তিত্ব জানাইতেছে, এবং আমারই সহিত সম্মিলনের জন্য অগ্রবর্ত্তী হইতেছে। এইপ্রকারে যখন তোমার এই শরীর হইতে জীবনরূপী সমস্ত অণুপলগুলিই বহির্গত হইয়া আমাতে ( সময়ে বা কালে) সম্মিলিত বা লীন হইবে, তখন আর তোমাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকিবে না।—বুঝিলে কি ?

যাহাহউক, এইরূপে আমি তোমার সহিত সর্ব্বদা সম্মিলিত থাকিলেও, তুমি যে আমাকে দেখিতে পাও না, তাহার কারণ কি শুনিবে ? তুমি তোমার এই ভৌতিক দেহকেই 'তুমি' বা 'আত্মা' মনে করিয়া উহার অভিমানে তোমার 'প্রকৃত তুমি'কে ভুলিয়া রহিয়াছ। যখন এই অভিমান-গ্রন্থি-বিমুক্ত হইয়া তুমি তোমার আপনার ( নিজ আত্মার ) স্বরূপ দেখিতে পাইবে, তখন আমিই যে তোমার প্রিয় বন্ধু প্রাণ-রূপে তোমাতে বাস করিয়া আছি, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। আমি সকলেতেই বাস করি, তন্মধ্যে যে আমাকে চিনিতে পারে, সেই সকল প্রকার যাতনা হইতেই নিস্কৃতি পায়।

আমি অনন্ত ও অসীম,—আমারই শক্তি দ্বারা সমগ্র জগৎ বিকশিত হইয়া আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ ! সংসারবাসী মানব শরীর-ধারী প্রাণিগণ রিপুরূপ অনায়ত্ত অনুচরগণের পীড়ন দ্বারা আত্মবিস্মৃতিগ্রস্ত হওয়ায়, এখন আমার সহিত সদ্ব্যবহার করা দূরে থাকুক, আমায় একরূপ ভুলিয়াই রহিয়াছে। সেইজন্যই এখন আমি আরাম-পরিশূন্য। আমার সৃষ্ট, আমাতেই স্থিত, এই সংসার এখন

আমারই যাতনাপ্রদ বোধ হইতেছে। যদি আর কিছুকাল আমাকে এই আরামবিহীন দুষ্টাচারপ্রিয় প্রাণিগণের সহিত এ ভাবে বাস করিতে হয়, তবে আমি 'কাল' বা 'কৃতান্ত' রূপে সমস্তই সংহার বা আত্মসাৎ করিব।

এখন থাকুক ও কথা। যদি তুমি আমাকে আরামের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমা দ্বারা তোমারও উপকার হইবে। সে উপকার কি, তাহা ক্রমে নিজেই বুঝিতে পারিবে। আরামের সহিত সাক্ষাৎলাভে আমার নিজের বিশেষ কোন উপকার নাই; কারণ, আমার নিজের আরাম কোনক্রমেই তিরোহিত হয় না। তবে যে আমায় 'আরাম! আরাম!' করিয়া অস্থির দেখিতেছ, এ কেবল তোমাদেরই (প্রাণিমণ্ডলীর) মঙ্গল উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কিছুরই জন্য নহে। সামর্থ্য থাকে ত ইহার সত্যাসত্য বিচার কর।' এই বলিয়া 'কাল' অন্তর্হিত হইলেন,—স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল।

স্বপ্ন ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু চিন্তা ঘুচিল না। কালের এই চেতনা উদ্দীপক উপদেশ সকল নিরন্তর অন্তঃকরণে আন্দোলিত হওয়ায়, 'আরামের অনুসন্ধান-জন্য সংসার-বাসী মাদৃশ আত্ম-বিস্মৃত মানব-শরীর-ধারী জীবের কর্ত্তব্য কি?' ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। তাহার ফলেই এই "আহ্নিক-ক্রিয়া" পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'সংসার', 'বাসস্থান', 'আত্মা', 'বিস্মৃতি', 'জীব', এবং 'জীবের আত্ম-বিস্মৃতি-কালীন কর্ত্তব্য'—এই কয়েকটী বিষয় যথাশক্তি আলোচিত হইল।

# আহ্নিক-ক্রিয়া



সংসারবাসী আত্মবিস্মৃত জীবের

দৈনিক ও সাময়িক কর্ত্তব্য।

---
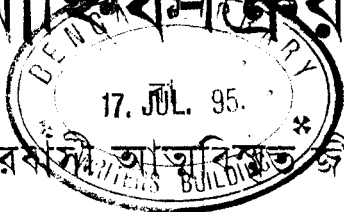
## প্রথম আহ্নিক।

### সংসার।

এই যে দেশে আমরা দলবদ্ধ হইয়া সশরীরে বাস করিয়া আছি, ইহারই একটী নাম সংসার। 'সংসার' এই শব্দটী শুনিলেই, উদাসীন ইহাকে 'অসার বস্তু' মনে করেন,—বিলাসী, 'সুখের নিলয়' মনে করেন,—দরিদ্র, 'কারাগার' মনে করেন,—বিপন্ন, 'বিপৎসাগর' মনে করেন,—শোক-কাতর, 'বিরহ নিবাস' মনে করেন। এইরূপে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই এই সংসারকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাবিয়া এবং বিভিন্নরূপে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু এই 'সংসার' যে বাস্তবিক কি, তাহা ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা ব্যতীত আর যে কে বলিতে পারেন, জানি না।

আমার বোধ হয়, এই 'সংসার' একটী সুন্দর 'বাজার'। মূল্যের সঙ্গতি থাকিলে, এই বাজারে যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা

করেন, তিনি তাহাই পাইয়া থাকেন। তবে এই বাজারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অধিক মূল্যবান্ কেবল একটী মাত্র বস্তু আছে, তাহার নাম 'সুখ'।

এই উৎকৃষ্ট পণ্য 'সুখ'কে ক্রয় করিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল। বস্তুতও দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা অসংখ্য সৈন্য নষ্ট করিয়া রাজত্ব প্রার্থনা করেন, সুখের জন্য,—বিলাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নিজ শরীরাদিকে শোভিত করেন, সুখের জন্য,—ইন্দ্রিয়পরায়ণ আত্মগৌরব ও লজ্জা-ভয় ভুলিয়া কদাচার করেন, সুখের জন্য,—ভিক্ষাব্যবসায়ী শীতাতপ সহ্য করিয়া প্রভাত হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ভিক্ষা করে, সুখের জন্য;—এইরূপ যে ব্যক্তি যে কোন প্রকার কার্য্যই করুন না কেন, সুখ লাভ করা সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাজারে যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা যাউক না কেন, কোন ব্যক্তিই মন খুলিয়া বলেন না যে, 'আমি সুখী'।

"তবে কি সংসারে প্রকৃত-সুখ নাই? আর যদি থাকে, তবে এখানকার কোন ব্যক্তিই কি সেই নিত্য সুখের অধিকারী হইতে পারেন না?"—এক সময় চিত্ত এইরূপ সন্দেহযুক্ত হওয়ায়, দৈবযোগে কোন মহাজনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে উল্লিখিত সংশয় অপনোদনের জন্য জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "বোধ হয়—তুমি স্বীকার করিবে যে, মানবশরীরধারী প্রাণিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই, কোন না কোন সময়ে, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও, 'সুখ' বা 'আরামের' আস্বাদ পাইয়াছেন; এবং সেই আরাম-ভোগের সময় শরীর ও মনের যে কেমন রমণীয় অবস্থা হয়, তাহাও বোধ হয় সকলেই

জানেন। কিন্তু সেই অবস্থা অতীব অল্পকালস্থায়ী বলিয়া, তজ্জনিত আনন্দ-ভাব আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। যে অবস্থায় অন্তঃকরণ কখনই ঐরূপ আরাম হইতে বিশ্লিষ্ট না হয়, তাহারই নাম 'নিত্যসুখ'। এই নিত্য-সুখান্বেষী ব্যক্তি ধীরে ধীরে পরীক্ষা দ্বারা ক্রমশঃ যখন সাংসারিক সমস্ত বস্তুই অনিত্য বুঝিতে পারেন, তখন কেবল নিত্যসুখ-নিদান সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না।

এখন আমাদের স্থিরভাবে ভাবিয়া বুঝা উচিত যে, এই সংসারই আমাদের ঐ নিত্য-সুখ-নিলয় শিবশক্তিতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইবার পরম সহায় ও অদ্বিতীয় স্থান। কারণ এই সংসার-দ্বারাই তাঁহার সর্ব্বেশ্বর বিশ্বরূপের প্রকাশ; এবং এই সংসার-লোপেই তাঁহার অদ্বিতীয় নির্গুণাবস্থা। যখন এই বিশাল-জগৎ-রূপ-জগদীশ্বর এবং তন্নিবাসী জীব-রূপ-জগদীশ্বর একীভূত বা সম্মিলিত হন, তখন আত্মাভিমানত্যাগী জীবের যে কি অবস্থা হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইবার ভাষা নাই। তবে, জীব-সমাজের কার্য্য দেখিয়া বুঝা যায়, যে, তাঁহারা যখন সর্ব্বদা সকল কার্য্যে কেবল সুখই প্রার্থনা করিতেছেন, তখন এই সংসারই তাঁহাদের সুখ-প্রাপ্তির উপায় বা সহায় বলিয়া বোধ হয়। কারণ, প্রাণিগণ সংসার ছাড়িয়া (দেহত্যাগ করিয়া) যে কিসের জন্য কোথায় যায়, এবং কিরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তাহার কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। শাস্ত্রালোচনপ্রিয় ব্যক্তিগণ বলেন যে, মৃত্যুর পর প্রাণিগণ দেহান্তর লাভ এবং স্বকর্ম্মানুসারে ফল-ভোগ, করে। ইহা শাস্ত্রোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা মীমাংসিত হইলেও, এই বর্ত্তমান-শরীর-ধারণ-কালে যতক্ষণ এই সংসারে থাকিতে

হইবে, ততক্ষণের জন্য আমাদের কর্ত্তব্য কি? অন্তঃকরণে স্বতঃই এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়।

আত্মচিন্তাপর মনস্বী ব্যক্তিগণের নিকট শুনা যায় যে, মনই প্রাণিগণের চালক; এবং প্রাণ (আত্মা) বা প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরই মনের নেতা। চালক মন আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করেন, আমরা প্রায় কিছুতেই তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারি না। কার্য্যের সহিত মনেরও আবার এমন নিকট সম্বন্ধ যে, যদি কোন ব্যক্তি, চালক মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করেন, তবে সেই কার্য্যের জন্য মনও অসন্তুষ্ট হন। সুতরাং 'আরাম' বা 'সুখ' অন্তর্হিত হয়; এবং যতক্ষণ না ঐ ব্যক্তি সেই অসন্তুষ্ট মনের পুনঃ সন্তোষ বিধানে সমর্থ হন, ততক্ষণ আর কোনক্রমেই তাঁহার পুনর্ব্বার আরামলাভ হয় না।

এখন অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "আমাদের মন যদি কখন প্রফুল্লভাবে আমাদিগকে কুসংসর্গ, প্রাণিহিংসা প্রভৃতি সাধারণের আরাম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে মনের অনুরোধে তাহা ত আমাদের করা উচিত? না করিলে মনের আরাম-ভঙ্গ করণ-জনিত অপরাধে ত আমাদিগকে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে?"

সদাশয় মহাজনগণ ইহার উত্তরে বলেন,—মন, সত্যস্বরূপ প্রাণ বা প্রাণরূপ পরমেশ্বরেরই স্বভাবতঃ অনুগত পদার্থ। এরূপ মন হইতে কোনপ্রকার দূষিত-বাসনা উদ্ভূত হইতেই পারে না। তবে মনে যে দূষিত ভাব উৎপন্ন হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে, তাহার কারণ এই যে, দেহাত্মাভিমানী মানব-শরীর-ধারী প্রাণিগণের আত্ম-বিস্মৃতি-জনিত

শক্তিহীনতাপ্রযুক্ত মন যখন নিজ প্রকৃতি ছাড়িয়া কাম-ক্রোধাদির অধীন হন *সুতরাং বিকৃত ভাব ধারণ করেন,) তখন তিনি নিজ স্বাভাবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কার্য্য করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ঐরূপে বাধ্য হইয়া কোন কদাচার করিতে আদেশ করিবার পরই, মন আতঙ্কে কম্পিত হইতে থাকেন। এই জন্যই, যে ব্যক্তি কুৎসিত কার্য্য করেন, তিনি কখনই উহা নির্ভীকচিত্তে ও প্রকাশ্যভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন না। যখন মনের এবং কার্য্যপ্রবৃত্ত ব্যক্তির এইপ্রকার অবস্থা ঘটে, তখন যদি ঐ ব্যক্তি ক্ষণকাল ঐপ্রকার কার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিতে অবকাশ পান, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিতে পারেন যে, তাঁহার মন বিবেকের উত্তেজনায় আতঙ্ক ও যাতনায় কাতর হইয়া, তাঁহাকে ঐ কার্য্য করিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেছেন *।

যে ধারণাশীল ব্যক্তি স্বায়ত্ত মনের আদেশানুসারে তৎ-প্রদর্শিত নিজের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারেন, মন তাঁহাকেই এই সংসার-বাজারে অবিনশ্বর আরাম, বা নিত্য-সুখ, প্রাপ্তির সোপান দেখাইয়া দেন। নতুবা যে ব্যক্তি মনকে স্বায়ত্ত না করিয়া কেবল আরাম বা সুখাকাঙ্ক্ষায় (উদাসীন বা সংসার-ত্যাগী হইব ভাবিয়া) গৈরিক-বসনাদি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপূর্ব্বক পরিভ্রমণ, এবং তদুচিত বাহ্য আচরণ করেন,

---

* এই অবস্থাকে সচরাচর মনে খট্‌কা লাগা কহে। বস্তুতও বলবান্ রিপুর সহিত বিবেকের সংগ্রাম ব্যতীত আর কোন কারণেই অন্তঃকরণ-মধ্যে এই প্রকার কোলাহল ও অশান্তি উদ্ভূত হয় না।

তিনি ঐরূপে কোন কালেও প্রকৃত আরাম বা নিত্য-সুখ ভোগে অধিকারী হইতে পারেন কি না, তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

স্থির হইয়া ভাবিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, সংসারকে ত্যাগ করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই; এবং ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইবারও কোন স্থান নাই; সুতরাং তাহা ধর্ম্মেরও অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, এ সংসার যাঁহার সৃষ্ট, তিনিই যখন ইহার সহিত অভিন্নভাবে মিলিয়া লীলা করিতেছেন, তখন আমরা তাঁহারই কৃপা-সৃষ্ট ক্রীড়নক হইয়া, স্রষ্টার নিজের, সংসারে উদাসীন বা নির্লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার সংসার, কি শক্তিতে এবং কোন্ সাহসে ত্যাগ করিতে যাই? যতক্ষণ সংসার আছে, ততক্ষণ তিনিও আছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; অতএব যদি আমরা তাঁহার সংসারকেই ত্যাগ করিলাম, অর্থাৎ সংসারের সকল বিষয়েই উদাসীন হইলাম, তবে কে বলিতে পারে যে, আমরা তাঁহাকেই ত্যাগ করিতে, বা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-ধ্যানে উদাসীন হইতে, প্রস্তুত নহি? ফলতঃ যতক্ষণ আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র দেহরূপ সংসারের কোনপ্রকার সেবায় বাধ্য থাকিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা বাহ্য-সংসার-ত্যাগ-কামনারও অনধিকারী।

এই সম্বন্ধে সমদর্শী সাধুপুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, 'সংসার-ত্যাগ বা সংসারে ঔদাসীন্য-প্রকাশ সংসার-স্রষ্টার অভিপ্রেত নহে। কারণ, প্রকৃত পক্ষে সংসার ত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তিই তাঁহার নিজেরই অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। যে ব্যক্তি আপনার অস্তিত্বই রক্ষা করিতে অশক্ত, তিনি কিরূপে ভগবানের অস্তিত্ব রক্ষা (স্বীকার) করিতে পারেন?'

উল্লিখিত সাধু-বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা এইরূপ বোধ হয় যে, এই সংসারে যতক্ষণ 'আমি আছি' * বলিয়া বিশ্বাস আছে, ততক্ষণ ইহা 'কারাগার', 'অসার বস্তু' প্রভৃতি যাহাই হউক না কেন, যদ্দ্বারা মন 'আরাম' বা 'সুখ' পায়, সেইরূপ কার্য্য করিয়া আমি এই সংসারেই থাকিতে বাধ্য। সংসার যদি 'কারাগার' হয়, তবে এই কারাগারে থাকিয়াই সকল অপরাধীকে (প্রাণীকে) সমান জ্ঞান করিয়া, অল্প বা অধিক শ্রমকর সকল কার্য্যই এমন যত্ন ও আহ্লাদের সহিত সম্পাদন করা কর্ত্তব্য যে, তদ্দ্বারা যতদিন এখানে থাকিতে হইবে ততদিন এখানকার সকলেই, এমন কি, কারা-রক্ষক (বিনিই হউন) পর্য্যন্তও, যেন জানিতে পারেন যে, একজন 'কর্ম্মণ্য অপরাধী' এখানে আসিয়াছিল। আর এই সংসার যদি 'অসার বস্তু' হয়, তবে এই অসারের মধ্যে থাকিয়াই কৌশলক্রমে 'সার বস্তু' অনুসন্ধানের এমন চেষ্টা করা উচিত যে, তাহাও যেন সকলেরই জ্ঞান-গোচর হইতে পারে। এইরূপ যত্নই আমাদের নিত্য-সুখ-প্রাপ্তির মূল উপায়। পরে যখন আমাদের সংসার-ত্যাগের (মৃত্যুর) কাল আসিবে, তখন যে আমরা

---

* বস্তুতঃ আমাকে (প্রাণ-সংশ্লিষ্ট-শরীর-বিশিষ্ট ভূতগণকে) লইয়াই সংসার। কারণ, যতক্ষণ আমার নিজের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়, ততক্ষণই আমার বিষয় সম্পত্তি, আত্মীয় স্বজন, সুখ দুঃখ, ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান এবং সর্ব্বেশ্বর ভূতনাথ পর্য্যন্ত সকলেরই অস্তিত্ব অনুভূত হয়। কিন্তু আমি না থাকিলে আমার সহিত ঐ সমস্ত সাংসারিক পদার্থও যে কোথায় যায় ও কি হয়, আর আমিই বা কি হই, তাহার কিছুই বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় না।

কোথায় গিয়া কি করিব, বা কি হইব, এখন তাহার কিছুই স্থির বুঝা যায় না। তবে সংস্কারানুসারে এই বোধ হয় যে, আমাদের চালক মন যখন স্বাভাবিক-নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি আপনিই সতর্কতা লাভ করেন; সুতরাং ক্রমশঃ সদসদ্বিচারক্ষম হইয়া আমাদিগকে নিত্যসুখান্বেষণে সচেষ্ট করেন। পরে কালক্রমে যখন আমাদের ঐ সুখ লাভ-কামনা কিয়ৎপরিমাণে সফল হয়, তখন নিত্যসুখময়-প্রদেশ-নিবাসী 'বিবেক' অন্তরে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে তদ্দেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলেই আমরা নিত্য-সুখ লাভের অধিকারী হইতে পারি। এই নিত্য-সুখ লাভের নামই সংসার মুক্তি।

ফলতঃ এই দেহের পরিণাম যাহাই হউক না কেন, তজ্জন্য এখন হইতে ব্যাকুল না হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা ও কালের উপর নির্ভরপূর্ব্বক আমাদিগের এরূপ সতর্ক হইয়া চলা উচিত যে, কোনক্রমেই যেন মনের আরাম বা স্বচ্ছন্দতা লাভের যত্ন হ্রাস না হয়। তাহা হইলেই আমরা ক্রমশঃ আত্মসংযমরূপ মূল্য-দ্বারা এই সংসার-বাজারে সকলেরই অভীষ্ট বস্তু—নিত্য-সুখ লাভে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সার উপদেশ।

# দ্বিতীয় আহ্নিক।

## বাসস্থান।

যে ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করেন, সেই, তাঁহার বাসস্থান। বাসস্থান প্রাণিমাত্রেরই প্রিয়পদার্থ। যাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, তিনিই জানেন যে, বাসস্থানাভাবে কত ক্লেশ হয়। ভিখারী হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেই বাসস্থানকে ভালবাসেন, এবং যত্ন করেন। এমন কি, বোধ হয় সেই জন্যই, অনেকে বাসস্থানকে 'বিরাম-মন্দির' বলিয়াও উল্লেখ করেন। কিন্তু এই বাসস্থান-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে এই সংসার-রূপ বিশাল বাসস্থানের প্রতিও অনায়ত্ত চিত্ত, সময় সময় কেমন বিরক্ত হইয়া উঠে। আবার কখনও ইহাকে অলীক বস্তু, কখনও বা ভৌতিক ব্যাপার, বলিয়া বোধ করে। যখন ইহাকে 'অলীক বস্তু' বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তখন নিজের প্রতিও কেমন একপ্রকার উপেক্ষার উদ্রেক হয়। আর যখন ইহাকে 'ভৌতিক ব্যাপার' বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তখন যেন ভয়ে, হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে; এবং অনুমান হয়, প্রাণিগণ যখন এই 'ভৌতিক ব্যাপার' হইতে কোনরূপে অব্যাহতি পায়, তখনই সে আপনার নিত্য-নিবাসে (শিবশক্তির আশ্রয়ে) গিয়া নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিতি করিতে পারে।

এইরূপ অনুমান দ্বারা সংসারের অসার কামনা-নিরত অবিবেকী চিত্ত, কেমন একপ্রকার অভিনব গম্ভীর ভাব ধারণ করে; এবং কত নূতন নূতন বিষয় জানিতে চাহে! কখনও জানিতে ইচ্ছা করে,—"এই সংসার-নিবাস যদি এতই

অকিঞ্চিৎকর বস্তু হইল, তবে ইহাতে এত আসক্তি জন্মে কেন? আর যদি শক্তিহীনতা-বশতঃ এই অকিঞ্চিৎকর পদার্থের প্রতি আকর্ষণই জন্মে, তবে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ এই ভ্রান্তি অপনয়নপূর্ব্বক সার-বস্তু প্রাপ্তির পথে গতি ফিরাইয়া দেন না কেন?—আর এক কথা, সংসার যদি বাস্তবিক অকিঞ্চিৎকর বস্তুই হইল, তবে জ্ঞানবান্ শাস্ত্রকারগণ ইহাকে সংসারবাসীর 'প্রধান আশ্রম' বলিয়াই বা স্থির করিয়াছেন কেন?" চিত্ত এই সকল প্রশ্নের প্রায়ই কোন তৃপ্তিকর উত্তর পায় না। অথচ তাহার এমনই কুস্বভাব যে, সে ও যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়, তাহার একপ্রকার মীমাংসা না করিয়া প্রায় নিরস্ত হয় না। সুতরাং যতক্ষণ না পরিতৃপ্ত হয়, ততক্ষণ শক্তি অনুসারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে।

এই সম্বন্ধে এক দিনের একটী ঘটনার বিষয় স্মরণ হইল। একদা আমার ঐরূপ কুস্বভাবসম্পন্ন চিত্ত উল্লিখিত প্রশ্নত্রয়ের সদুত্তরপ্রাপ্তির নিমিত্ত অনেক চেষ্টাতেও যখন কৃতকার্য্য হইল না,—অথবা প্রকৃত চেষ্টা না হওয়ায় উহার সদুত্তর পাইল না,—তখন সে স্তম্ভিতভাবে কত কি ভাবিতে লাগিল; এবং অনেক-ক্ষণ ভাবনার পর সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে চিন্তাটী এখন অবিকল স্মরণ নাই, বোধ হয় এইরূপ;—

চিত্ত প্রথমতঃ ভাবিল, এই যে বিশাল সংসার-নিবাস—অসীম রাজ্য,—ইহা কাহার অধিকৃত? এবং ইহার পরিণামই বা কি?—কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর, মন আপনিই মীমাংসা করিল,—এ সংসার বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের রাজ্য, এবং সেই 'মহা-সংসারীর' ইচ্ছা হইলেই তিনি তাঁহার এই সংসার-

নিবাসের লীলা খেলা ভাঙ্গিয়া, উদাসীন হইবেন*। তিনি একজন 'মহা-সংসারী' এবং 'মহা-উদাসীন' ব্যক্তি; যখন তাঁহার সংসার স্থাপন করিতে বাসনা হয়, তখন তিনি আপনার সংসার আপনিই নির্ম্মাণ করিয়া লন; আবার যখন সম্পূর্ণরূপে উদাসীন বা সঙ্গহীন ভাবে আপনাতেই আপনি থাকিতে বাসনা করেন, তখন এমন সুন্দর,—এত বড়—সংসারটী নিমেষে ভাঙ্গিয়া, তাহাই হন।

যখন ভগবান্ সংসার সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা হয়, (প্রত্যেকের নিজ চিত্তের অবস্থাই ইহার প্রমাণ) যে, আমার সংসার আনন্দে পূর্ণ হউক; এবং সংসারের সকল পদার্থ আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকুক। আমি সকলকে আহার দিব,—আমি সকলকে ভালবাসিব,—আমি সকলকে সমান দেখিব;—কিন্তু সকলে যেন আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া আমাকে 'হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা' বলিয়া মান্য করে।"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কুচিন্তা-স্পর্শে চিত্তের গতি ফিরিল।

যাহা হউক, সেই শুভ-যোগ-কালীন চিত্তের উক্তরূপ চিন্তা-প্রসূত কথাগুলি স্মরণ হইলে আজিও আনন্দ জন্মে। বোধ হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মে, সংসার-বাসী প্রায় প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষই, বাল্যাবস্থা হইতেই, সকলের উপর কর্ত্তা বা কর্ত্রী হইতে বাসনা করেন। আমি একদিন স্বহস্তে ধন বিতরণ করিব,—একদিন আদেশ করিয়া অনুচরদিগের দ্বারা দরিদ্রগণকে ভোজন করাইব,—একদিন

---

* এই অবস্থাতেই, জগতের মহাপ্রলয় হয়; অর্থাৎ জগন্নাথ নিজসৃষ্ট জগৎ আপনাতেই সংহারপূর্ব্বক একাকী (অদ্বিতীয়) হইয়া অবস্থান করেন।

স্বাধীন হইয়া সকলকে স্নেহ করিব,—একদিন আমার সংসারকে সুন্দর করিয়া সাজাইব,—ইত্যাদি নানাপ্রকার কর্ত্তৃত্ব বা স্বাধীনত্ব প্রায় সকলেই প্রার্থনা করেন; এবং যে ব্যক্তি আপনাকে সৃষ্টি-কর্ত্তার দাসত্বে নিযুক্ত রাখিয়া, তাঁহারই সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহেন, তিনিই উহা পাইয়া থাকেন। এই জন্যই বোধ হয়, এই 'কর্ত্তা' হইবার কামনাটী আমাদের আদিপুরুষ ভগবান্ হইতেই পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

যাহা হউক, প্রাণিগণ যদি এইরূপ 'কর্ত্তা' হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সংসার-বাসস্থানকে 'ভঙ্গুর' বুঝিতে পারিয়া, 'নিজের পদার্থ' সমূহ (শুভ বৃত্তি সকল) আয়ত্ত করিয়া, নিজ নিত্য-নিবাস-যাত্রার জন্য নিরন্তর প্রস্তুত থাকিতে পারেন, এবং প্রস্থানের কাল উপস্থিত হইলেই, নিজের সুকৃতি-লব্ধ সম্বল-দ্বারা আপনার আবাসে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইতে পারেন, তবেই সংসার-পান্থ-নিবাসে তাঁহাদের 'কর্ত্তা' হওয়া সার্থক।

নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত না হইলে কাহারও সংসার-পান্থ-শালা পরিত্যাগ করিয়া, কোন স্থানে যাইবার সামর্থ্য নাই। অতএব এই ভঙ্গুর বাসস্থানে, ভঙ্গুর দেহকে অবলম্বন করিয়া, যে কয় দিন থাকিতে হয়, সে কয় দিন, যেরূপ আচরণ করিলে কোন-প্রকার দুঃখেই আমাদিগকে অভিভূত হইতে না হয়,—অর্থাৎ চিত্ত কোন ক্লেশ বোধ না করে,—তাহা করাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই মহাকার্য্য-সাধন-জন্য আমাদের ক্ষুদ্র সংসারকে সুন্দররূপে সাজাইয়া,—সাংসারিক আত্মীয়-স্বজনে পরিবৃত থাকিয়া,—অথবা যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, যথাসাধ্য অনাসক্তভাবে আরাম-প্রাপ্তিই আমাদের প্রয়োজন।

অতএব বিশ্বনাথের এত যত্নের সংসারকে অযত্ন না করিয়া, (প্রাণ ভগবচ্চরণে নিত্যাশ্রয়প্রার্থী হইবার পূর্ব্বে তাঁহার সাংসারিক কার্য্যে উদাসীন না হইয়া,) তাঁহার সংসারে তাঁহারই পরিজন লইয়া তাঁহারই অভীপ্সিত কার্য্য * সাধন-দ্বারা আপনার আবাস-পথে অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকাই আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য। কেবল বাক্যে নহে,—কার্য্যতঃ এইরূপ করিতে পারিলে, যাঁহারা সংসার-বাসস্থানে বাস করা ক্লেশজনক বোধ করেন, তাঁহারা আপনাদিগের চিরপ্রার্থিত 'আরাম'লাভে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

---

# তৃতীয় আহ্নিক।

## আত্মা।

সচ্চিদানন্দময় ভগবানের নামের এমনই মহীয়সী শক্তি যে, ঐ নাম যখন নামানুরাগী মানবের হৃদয়-মন্দিরে অবাধে প্রতিধ্বনিত হয়, তখনই সেই ব্যক্তি ভগবান্‌কে নিজের অভীষ্টদেবরূপে আপনাতে আবির্ভূত দেখিতে পান। একাগ্র-সাধন দ্বারা যাঁহার এই অবস্থা উপস্থিত হয়, তিনিই ভগবানের প্রতি অবিচলিত-বিশ্বাস-সংস্থাপনে সমর্থ হন।

আমার মলিন হৃদয় যদিও ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সংস্থাপনে এখনও সমর্থ হয় নাই, তথাপি, যে কোন কারণেই

* শান্ত (সচ্চিন্তা-নিরত) চিত্ত যে কার্য্য করিতে অনুমতি করেন, তাহাই মঙ্গলবিধাতা ভগবানের অভীপ্সিত কার্য্য।

হউক, যখন কাতর হইয়া,—"দীননাথ! তুমি ভিন্ন আমার যে আর 'আমার' বলিতে কেহই নাই" বলিয়া, হাত দুখানি যোড় করিয়া, দীন-ভাবে দাঁড়াই, তখন যেন এই হীন হৃদয়ও কোন নূতন প্রদেশ হইতে কত কি রমণীয় অভিনব সামগ্রী দেখাইয়া আমাকে পরম-পিতার সান্ত্বনা জ্ঞাপন করে। সে সময় হৃদয় এমন এক শক্তি লাভ করে, যে বোধ হয়, তদ্দ্বারা তখন, আমার যাহা ইচ্ছা হয়, যেন আমি তাহাই সম্পন্ন করিতে পারি। সেই শুভক্ষণ অতীত হইলে পর, যদি সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় অবস্থার কথা কখনও চিন্তা করা যায়, তাহাতেও মনে হয়, হৃদয়ের সেই অবস্থায় যেন কি এক সর্ব্বব্যাপিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মহা-শক্তি * আসিয়া আবির্ভূতা হন; এবং তাঁহা-রই প্রভাবে প্রাণ কি একপ্রকার অতুলনীয় অভিনব ভাবে মগ্ন হইয়া, কি এক অনির্ব্বচনীয় চমৎকার রূপ দর্শন করে।

মর্ত্ত্যধাম-নিবাসী যে ব্যক্তি উল্লিখিত ভাব বা রূপকে নিরন্তর আপনাতে বিরাজমান বুঝিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত 'মহাজন'-পদবাচ্য। কারণ, সমগ্র জগতেই তাঁহার নিজের পূর্ণ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়; অর্থাৎ সকলকে লইয়াই যে তাঁহার পূর্ণ নিজত্ব সঙ্ঘটিত, তাহা অনায়াসেই তিনি বুঝিতে পারেন। আর উল্লি-খিত মহাশক্তির যে অপূর্ণ বিকাশ দ্বারা উক্তপ্রকার পূর্ণ অস্তিত্ব উপলব্ধি না হইয়া আমরা কেবল আপনারই অস্তিত্ব বা বর্ত্তমানত্ব ('আমি আছি' এই ভাব) মাত্র উপলব্ধি করিতে পারি, তাহারই নাম 'আত্মা'।

---

* এই মহাশক্তির নামই পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, পরা শক্তি ইত্যাদি।

এই 'আত্মা' জীবমাত্রেরই শরীরে সঙ্কুচিত বা অপূর্ণ বিকশিত অবস্থায় অবস্থিত বলিয়া ইহাঁরই প্রচলিত সাধারণ নাম 'জীবাত্মা'। যে জীবাত্মা নিরন্তর উল্লিখিত জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তির প্রভায় বিকশিত (আত্মজ্ঞানসম্পন্ন) তাঁহাকে যুক্ত (যোগনিরত) বলা যায়। এবম্প্রকার যুক্তাত্ম ব্যক্তিই সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সদানন্দ এবং সকলেরই নিকট চিরকাল দেবরূপে পূজিত হইয়া থাকেন *।

আমরা আত্মার এই পূর্ণশক্তিসম্পন্নাবস্থার ভাব (যুক্তভাব) ভুলিয়া † কেবল ঐ ভাবের ছায়ামাত্র উপলব্ধি করাতেই আপনার অস্তিত্ব ('আমি আছি' ইহা) বুঝিতে পারি। আমাদের এই অবস্থারই নাম 'আত্মবিস্মৃতি'। এই অবস্থায় অবস্থিত থাকা প্রযুক্তই, আমরা আমাদের 'আমি'কে ভুলিয়াও যেন পরম সুখেই সংসারে বাস করিতেছি। সময়, দিন দিন কেমন করিয়া যে কোথায় যাইতেছে, আর আমরাই বা বাল্য যৌবনাদি অবস্থা অতিক্রম করিয়া শেষে কোথায় যাইব, আমাদের মধ্যে প্রায় কাহারও তদ্বিষয়ে কোন প্রগাঢ় চিন্তা নাই। অথচ আত্মার এই অহংভাব (বিযুক্তাবস্থা) ‡-বশে সুখের আশায় আমার' 'আমার' করিয়াই অবিরাম পরিভ্রমণ করিতেছি।

---

* বুদ্ধ, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মানব-শরীর ধারী ব্যক্তিগণ এইরূপ যুক্তাত্ম (পরমাত্মনিরত) বলিয়াই দেব-(অবতার)-রূপে আমাদের পূজনীয়।

† কে ভুলায়, (বিস্মৃতি) চতুর্থ আহ্নিকে তদ্বিবরণ প্রকাশ হইবে।

‡ নিরন্তর 'আমি আছি', 'আমি করিতেছি', 'আমি দিতেছি', ইত্যাদি, আমার অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব বোধক আলোচনার নামই অহংভাব।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রকৃত সুখ বা আনন্দ * কিছুতেই প্রাপ্ত হইতেছি না; তথাপি চৈতন্য নাই।

এইরূপে সংসার-ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে, মানব-শরীর-ধারী প্রাণী যখন ভ্রম বা মোহ অন্ধকার বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল আত্মজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করেন, তখনই তাঁহার শান্তি, মুক্তি, দেবত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব অথবা ঈশ্বরত্ব ইত্যাদি সর্ব্বজনপ্রার্থিত অভীষ্টই সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ তখন সাধকের যে কি অবস্থা ঘটে, তাহা আমাদের বর্ত্তমান চিন্তাশক্তি বা কল্পনাশক্তিরও অতীত। ফলতঃ যত দিন মানব-শরীর-ধারী প্রাণী 'আমার' শব্দটী 'আমি'র সহিত অভিন্ন বুঝিতে না পারেন, ( সমগ্র জগৎকে আত্মময় দর্শন করিতে অসমর্থ হন, ) ততদিন পূর্ব্বোক্ত ভ্রম বা মোহ অন্ধকার মধ্যে তিনি কি এক প্রকার মলিনভাবে ( ঈশ্বর হইয়া অনীশ্বর ধারণা-বিশি ভাবে ) অবস্থিতি করেন। পরে যখন আপনাকে আপনি বুঝিতে পারেন, তখন তাঁহার যে কিরূপ অবস্থা জন্মে, তাহা বর্ণনার অতীত। আহা! কবে আমাদের সেই আনন্দময় অবস্থা আসিবে; যখন এই ক্ষুদ্র আমরাই, পূর্ণ 'আমি' বা সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্ম ভগবানে অভিন্নভাবে সম্মিলিত, ইহা বুঝিয়া কৃতার্থ হইব!

---

* 'আনন্দ' কাহাকে বলে, তাহা 'জীবন-পরীক্ষা' নামক গ্রন্থে সামর্থ্যানুরূপ বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

# চতুর্থ আহ্নিক।

## বিস্মৃতি।

নির্ম্মল ( অহংভাব-বিমুক্ত ) বা স্থির অন্তঃকরণ যখন কোন পবিত্র চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার কেমন এক-প্রকার 'স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি' উপস্থিত হয় ; এবং শারীরিক সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই প্রফুল্লভাবে ও প্রভূত বলসহকারে সেই চিন্তা-প্রসূত অভীষ্ট-সাধন-নিমিত্ত মনের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়। ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ সাহায্যে অন্তঃকরণ উক্ত প্রকার পবিত্র চিন্তায় যতই মগ্ন হন, ঐ স্ফূর্ত্তিও ততই বর্দ্ধিত হইয়া শরীরকে বলবান্ ও কান্তিবিশিষ্ট করিতে থাকে। কিন্তু যদি পবিত্র চিন্তার পরিবর্ত্তে কুচিন্তা * অন্তঃকরণ-মধ্যে কোনক্রমে এক-বার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পায়, তবে ক্রমশঃ অন্তঃকরণের আরাম ভঙ্গ হয়, এবং উহা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। পরে কুচিন্তা যতই বলবতী হইতে থাকে, চিত্তের সহিত শরীরও ততই অশক্ত ও নিষ্প্রভ হয়। এইরূপে অল্পকালমধ্যে কুচিন্তা-বশে অন্তরের আরাম-গ্রন্থি ছিন্ন হওয়ায় উহা অবসন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং উহার আর পূর্ব্ববৎ পবিত্র কার্য্যসাধনের শক্তিও থাকে না। অবশেষে অন্তঃকরণ পবিত্র চিন্তার বিষয় ধারণায়ও অশক্ত হন। এই ধারণাশক্তির অভাবের নামই 'বিস্মৃতি' †।

---

* কুচিন্তা কে, এবং কিরূপে তাহার উৎপত্তি হয়, তদ্বিবরণ 'জীবন-পরীক্ষা'-গ্রন্থে বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

† এই বিস্মৃতিকে সচরাচর 'আত্মবিস্মৃতি' কহিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ আত্মবিস্মৃতাবস্থাতেও উপরি উক্ত 'স্ফূর্ত্তির' যে কিছু অবশিষ্ট থাকে, উক্ত নিকৃ

আত্ম-বিস্মৃতিই মানবাত্মাকে শক্তিহীন ও মলিন করে। আত্মা এই বিস্মৃতির বশীভূত হইলে তাঁহার পূর্ব্বশক্তি (পবিত্র চিন্তা করিবার শক্তি) পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া বড়ই কঠিন। এমন কি, সেই শরীরধারণকালে আর প্রায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিস্মৃতি স্বকীয় শক্তিদ্বারা মনুষ্যের শক্তি (মনুষ্যত্ব) হরণপূর্ব্বক মানবকে প্রথমতঃ পশুভাবে পরিণত করে;* অবশেষে জড়পিণ্ডবৎ* অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে।

আর সাসাংসারিক-বিস্মৃতি-গ্রস্ত ব্যক্তি কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিতে পারেন না। এমন কি, তাঁহাকে যদি কোন সামান্য অথচ দীর্ঘকালব্যাপী, মানসিক-চিন্তা-জনক গার্হস্থ্য-কার্য্য করিতে হয়, তাহাও তাঁহার অসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ, তিনি সেই কার্য্যের আদিতে যাহা করেন, মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যান +। বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রকেও এই বিস্মৃতির অধীন দেখা যায়। তাহারা

---

স্মৃতি দ্বারাই সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহিত হয়। কিন্তু পীড়া বা বহুবিষয়ক চিন্তা দ্বারা মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে এই স্মৃতিরও যে অভাব ঘটে, তাহাকে 'সাংসারিক বিস্মৃতি' বলিতে পারা যায়।

* আত্মস্মৃতিসম্পন্নাবস্থায় এইরূপ জড়পিণ্ডবৎ অটলভাব প্রাপ্ত হওয়াকেই জীবন্মুক্তাবস্থা বা নির্ব্বিকল্প-সমাধি বলা যায়।

+ সাংসারিক-বিস্মৃতি-গ্রস্ত ব্যক্তিগণ কোন একটী চিন্তনীয় বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে যদি প্রসঙ্গক্রমে ক্ষণকাল অন্যবিষয়ক চিন্তা করেন, তবে তাঁহাকে প্রথম বিষয় ভুলিয়া যাইতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত ইহাও সচরাচর দেখা যায় যে, কোন একটী দ্রব্য লইবার জন্য এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনপূর্ব্বক উহা বিস্মৃত হইয়া তথায় কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ

বিস্মৃতি-বশে ক্রমশঃ এমন বিকৃতচিত্ত হইয়া পড়ে, যে পরিশেষে পাঠ্যগ্রন্থের চারি পংক্তিও অভ্যস্ত রাখিতে পারে না।

এইরূপ বিস্মৃতিকে অনেকে 'অন্যমনস্কতা' বলিয়া থাকেন; এবং এই 'অন্যমনস্কতা' শব্দের অর্থ 'ঐকাগ্র্যহীনতা' বলেন। এই একাগ্রতা বা একচিন্তাসক্তির অভাবে, অনেক ব্যক্তিকে এমন দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারা আহার-কালে ঝোলের পরিবর্ত্তে অন্নের সহিত জল মাখিয়া, মুখে গ্রাস তুলিবার সময় চকিত ও অপ্রতিভ হন। কিন্তু যখন আপনার চক্ষুর সম্মুখে নিজহস্তেই জলপাত্র হইতে জল ঢালিয়া অন্নের সহিত মাখিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের তদ্বিষয়ে জ্ঞানই থাকে না।

সহসা এইরূপ কথা শুনিলে, আমরা উহাকে প্রলাপ মনে করিতে পারি, অথবা এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেও, ইহার কর্ত্তাকে 'উন্মাদ' বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি; কিন্তু হায়! আমরাই যে কোথা হইতে অধঃপতিত হইয়া, কোথায় আসিয়াছি, এবং এখানে কি করিতে কি করিতেছি, আত্ম-বিস্মৃতিবশে তাহার ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! আর কোন মহাজন দয়া করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও ত তাঁহার কথায় বিশ্বাস করি না! 'আমরা' আহার, বিহার, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি অসংখ্য কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু 'আমরা কে?' তাহা ত আমরা জানি না; এবং তাহার ত কোন

---

বৃথা ভ্রমণানন্তর পূর্ব্বগৃহে প্রত্যাগমন করিবার পর, হয় ত উহা স্মরণ হয়। কিন্তু যখন, অভিলষিত দ্রব্য যে গৃহে আছে সেই গৃহে উপস্থিত থাকা যায়, তখন যে 'কি জন্য সেখানে যাওয়া হইয়াছে' তাহার কিছুই স্মরণ থাকে না। এইরূপ বিস্মৃতির প্রবলাবস্থায় সচরাচর উন্মত্ততা ঘটিয়া থাকে।

অনুসন্ধানও করি না। শয়ন-ত্যাগ-কাল হইতে পুনর্ব্বার শয়ন-গ্রহণ-কাল পর্য্যন্ত 'আমরা' বিবিধ বাগ্বিতণ্ডা ও অসংখ্য কার্য্যই করিয়া থাকি, কিন্তু কি বিষয়ে কথা কহি, কিরূপেই বা কথা কহি, কি কার্য্য করি, কাহার জন্য করি, এবং কাহার শক্তিতেই বা করি, এ সকলের কোনটীরই সদুত্তর দিতে আমরা অশক্ত।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, যদি পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুলি 'প্রলাপ' বা 'উন্মত্ততা' জনিত বলিয়া উপেক্ষিত হয়, তবে উল্লিখিত কার্য্য সকলও কি আমাদের প্রলাপ বা বাতুলতা ব্যঞ্জক নহে? চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি ইহা স্বীকার করেন, তবে তিনি একবার 'আপনার' দিকে দৃষ্টি করিয়া বলুন দেখি, আমরা কি আত্মবিস্মৃত নহি? অথবা আমরা কি কেবল মানব শরীর-ধারী, পশু পক্ষী কীটাদির ন্যায় নিকৃষ্ট প্রাণী * মাত্র নহি? যদি ইহা স্বীকার্য্য হয়, তবে কোন্ মহাশত্রু আমাদিগকে এমন করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? উৎকৃষ্ট আধার—মানব-শরীর—প্রাপ্ত হইয়া কেবল আহার-বিহারাদিদ্বারা জীবনকাল অতিবাহিত করাই কি আমাদের কর্ত্তব্য? বাল্য-যৌবনাদিক্রমে যে আয়ুষ্কাল অতিবাহিত হইতেছে, এবং দেহত্যাগের ভীষণ দিন যে ক্রমশঃ সন্নিকট হইয়া আসিতেছে, তাহার জন্য আমরা কি করিতেছি, তাহা কি

* পশু পক্ষী কীটাদি প্রাণিগণ আত্মবিস্মৃত ('তাহারা কে?' তদ্বিষয়ে অজ্ঞ) কি না তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। তবে 'আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রাণী' এই অভিমানবশতঃ, এবং আমাদের ন্যায় তাহাদের কোনপ্রকার ভাষাদি নাই বলিয়াই, সহসা বোধ হয় যেন তাহারা মানবাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণী।

একবারও আমাদের চিন্তা করা উচিত নহে? যদি ইহা স্বীকার্য্য হয়, 'তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি?' এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়।

একদা কোন সচ্চিন্তাশীল ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছিলাম, চিত্তের স্থিরতাই আত্ম-স্মৃতির ('আপনাকে' স্মরণ হইবার) একমাত্র উপায়। কারণ, চিত্তস্থৈর্য্যই প্রত্যেক পদার্থকে ইন্দ্রিয়ের গোচর করে; এবং তদ্বিষয়ক চিন্তা-দ্বারা তদুৎপন্ন শুভাশুভ ফল-নির্ণয়ে সমর্থ হয়। অতএব কোন পদার্থ দর্শনে, 'স্থিরভাবে' চিন্তা,—কোন শব্দ শ্রবণে, 'স্থিরভাবে' চিন্তা,—কোন অভাব-বোধে, 'স্থিরভাবে' চিন্তা,—কোন শত্রুর (রিপুর) উদ্দীপনে, 'স্থিরভাবে' চিন্তা,—এইরূপ যে কোন ঘটনা আসন্ন বা উপস্থিত হইলে, মন, 'স্থৈর্য্যাবলম্বন' বা 'স্থিরভাবে চিন্তা' দ্বারা সকল বিষয়েরই অতি নির্দ্দোষ উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন। স্থিরতার উল্লিখিত চিন্তোদ্দীপক গুণ থাকাতে ইহা আন্তরিক অশুভ প্রবৃত্তিনিচয়ের উত্তেজনাকে দমন করিয়া শুভ বৃত্তি সকলকে বলবতী করে; এবং উহা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ পবিত্র চিন্তাশক্তিও এত প্রখরা হয় যে, স্থিরভাবাপন্ন ব্যক্তি প্রায় সর্ব্বদাই আপনার মনোগত পবিত্র-ভাব-প্রসূত নানাবিধ বিষয় অনুশীলনপূর্ব্বক 'আপনার' সহিত অন্তর্জগৎকেও প্রত্যক্ষ করেন, এবং অবশেষে 'আনন্দ'লাভের অধিকারী হন।"

এই কথা শ্রবণের কিছু দিন পরে আমরা চিত্তস্থৈর্য্যের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম। একদিন কোন এক স্থিরচিত্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বিবিধ কথাপ্রসঙ্গের পর, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়! আমাদের মন

কোনক্রমেই স্থির হয় না কেন?"—এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে চিন্তার পর, ধীরে ধীরে কহিলেন,—"অভীষ্ট বিষয় স্থির হয় না বলিয়া।" উত্তর শ্রবণে আমরা স্তম্ভিত হইলাম। মনে হইল,—আহা! এই ব্যক্তি 'স্থির ভাব' অবলম্বন করিয়া না জানি কি সুখেই আছেন! বাস্তবিক এই বিষয় যদি কোন অস্থির (বিশৃঙ্খলচিত্ত) ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাইত, তাহা হইলে হয় ত কতই তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইত; এবং তদ্দ্বারা মনও সন্তুষ্ট হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু আনন্দ-লাভের শ্রেষ্ঠ সাধন স্থৈর্য্য বলে ঐ প্রশ্নটী একটী ক্ষুদ্র কথায় কেমন বিশদ ও তৃপ্তিকর রূপে মীমাংসিত হইয়া গেল!

যাহা হউক, যতদিন আমরা (আত্মবিস্মৃত ব্যক্তিগণ) উক্ত প্রকার স্থিরভাব অবলম্বন করিতে না পারিব, ততদিন আর কোনক্রমেই আমাদের 'আমি'র দর্শনলাভ বা আত্ম-পরিচয় হইবে না; এমন কি, 'আমি'র অনুসন্ধান বা আত্মচিন্তা পর্য্যন্ত করিবার ক্ষমতাও জন্মিবে না *। যখন আমরা আমাদের 'আমি'কে চিনিতে পারিব, তখন 'আমি' ব্যতীত বিশ্বে আর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব উপলব্ধি হইবে না। তখন 'আত্মার

---

* হিন্দু-শাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষিগণ, এই 'আমি' (আত্মা) দর্শনার্থ প্রস্তুত হইবার নিমিত্তই, 'সন্ধ্যাবিধি' নামে কতকগুলি মনোরম স্তোত্র রচনা করিয়া, স্নানাদি বাহ্য-শৌচ সমাধানানন্তর, দেবমন্দিরাদি নির্জ্জন স্থানে স্থিরভাবে উহা ভগবদুদ্দেশে আলোচনা করিবার বিধি দিয়া গিয়াছেন। এবং হিন্দুগণ যাহাতে উহার যথাকালীন আলোচনায় উদাসীন না হন, এজন্য উহার নিয়মিত উপাসনা না করাকেও মহাপাপ-জনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ যে মানব-শরীর-ধারী আত্মবিস্মৃত ব্যক্তি, যে কোন বিধানেই হউক, স্থিরভাবে আত্ম-চিন্তা-দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল না করিয়া,

বিশালতা',—'সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান',—ইত্যাদি ভাবও একেবারে অন্তর্হিত হইবে; অর্থাৎ তখন 'আমি' ( আত্মা ) বিশ্বরূপ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বা সংযুক্ত হইয়া যাইবে।

## পঞ্চম আহ্নিক।

### জীব।

সজীব ও জড় পদার্থের মধ্যে যে বাহ্যিক পার্থক্য আছে, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু কে যে এই জড়পদার্থকে শক্তি প্রদান-দ্বারা 'জীব' রূপে বিকশিত করে, এবং কিয়ৎকাল কত প্রকারেরই কার্য্য সাধন করাইয়া, উহাকে আবার 'জড়' রূপে পারিণত করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হয়, তাহার বিশেষ তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তবে আমরা সাধারণতঃ ঐ অলৌকিক পদার্থ অথবা শক্তিকে 'প্রাণ' বা 'জীবন' নামে অভিহিত করিয়া থাকি; এবং সেই জন্যই আমাদের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, যে পদার্থকে আমরা গমন বা বর্দ্ধন শীল দেখিতে পাই, উহাই জীবন-বিশিষ্ট বা চেতন; আর যাহাতে ঐ সকল কার্য্যের অভাব দেখা যায়, তাহাই জীবনহীন বা জড়। কিন্তু এই 'জীবন' যে কি পদার্থ, তাহার আকৃতিই বা কিপ্রকার, এবং তাহার এইরূপ আগমন ও অন্তর্দ্ধানেরই বা অভিপ্রায় কি, তর্কাদি পরিহারপূর্ব্বক এই সকল বিষয় দীর্ঘকাল স্থিরভাবে চিন্তা করিলে যে কি বুঝা যায়, তাহা বলিয়া সরলভাবে বুঝাইবার

---

ইতর প্রাণীর ন্যায় কেবল আহার বিহারাদি দ্বারাই জীবন-কাল বৃথা যাপন করে, তাহার ন্যায় দুঃখী সংসারে আর কেহই নাই।

ভাষা নাই। তবে ঐরূপ চিন্তা দ্বারা এইমাত্র বোধ হয় যে, এই 'জীবন' নামক পদার্থ বা শক্তি দ্বারাই 'জীব' ও 'জড়' সমন্বিত সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ। জীবন-হীন অবস্থায় কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; অতএব জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই জীবনবিশিষ্ট বা সজীব। তবে এই জীবন পূর্ণ (অভিন্ন-জীবনবিশিষ্ট) জগতের মধ্যে কোন পদার্থকে 'জীব' (জীবন-বিশিষ্ট), আর কোন পদার্থকে 'জড়' (জীবনহীন) বলিয়া যে আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির বোধ হয়, উহা, ভূতপঞ্চকের বিবিধ-কার্য্য-সাধন-হেতু অসমান ভাবে মিলন-নির্মিত, স্বচ্ছ ও মলিন আধারভেদে বিশ্বজীবনস্বরূপ ভগবানের অধিক বা অল্প বিকাশ প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে *।

ফলতঃ যাঁহার জীবন পূর্ণবিকশিত, আমরা তাঁহাকেই পূর্ণব্রহ্ম বা পরমেশ্বর, এবং তদপেক্ষা ক্রমশঃ অল্পবিকশিত পদার্থ সকলকে দেব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, ইত্যাদি বলিয়া থাকি। অনন্তর যখন অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রদ্বারা আমাদের চর্ম্ম চক্ষুর অগোচর কীটাণু প্রভৃতির দর্শনও সম্পন্ন হয়, তখন আমরা তদবশিষ্ট আর কোন পদার্থেই জীবনের অস্তিত্ব (জীবনী শক্তির লক্ষণ—গমন বর্দ্ধনাদি ক্রিয়া) দেখিতে না পাইয়া উহা-দিগকে জীবন-হীন বা 'জড়' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক ক্ষান্ত হই।

---

* জীবনের এই অধিক বা অল্প বিকাশপ্রযুক্তই মানব-শরীর-ধারী প্রাণি-মধ্যে বৃদ্ধাবস্থাতেও কাহাকে পশুবৎ অজ্ঞ, আর কাহাকেও বা বাল্যা-বস্থাতেই দেববৎ জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। ভগবানে আত্মনির্ভরশীল সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত জীবনের এইরূপ অধিক বা অল্প বিকাশের প্রকৃত কারণ আর কাহারও বলিবার শক্তি নাই।

সুতরাং স্থূলদর্শী মাদৃশ ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, 'জীব' ও 'জড়' এই উভয়বিধ পদার্থ-দ্বারাই বিধাতার বিশ্বরাজ্য পরিপূর্ণ। কিন্তু আত্ম-চিন্তাশীল অন্তর্দর্শী মহাজনগণ আপনাদের বিকশিত জীবনের মহীয়সী শক্তি দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, জগতে 'জড়' বা জীবনহীন কোন পদার্থই নাই। কারণ, এই 'জীবন' নামক অজ্ঞেয়, অসীম, পূর্ণ পদার্থেরই অপর নাম জগদীশ্বর। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যে পদার্থে 'জীবন' বা 'জগদীশ্বর' নাই, অথবা যাহা বিশ্বজীবন বা জগদীশ্বরের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, সেই পদার্থ কাহাকে অবলম্বন করিয়া,—কাহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া,—বিশ্বধামে অবস্থিত থাকিতে পারে * ?

অবিকশিত বা সঙ্কুচিত জীবনসম্পন্ন মাদৃশ ব্যক্তিগণের স্থূলদৃষ্টি দ্বারা সহসা প্রস্তর, কাষ্ঠ-খণ্ড, লোষ্ট্র প্রভৃতি গতি-বৃদ্ধি-বিহীন অসংখ্য পদার্থ 'নির্জীব' বা 'জড়' বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে, এবং যদি কোন ব্যক্তি ঐ সকল পদার্থকে 'সজীব' বলিয়া উল্লেখ করেন, তবে আমাদের বিবেচনায় তাহাও উপহসিত ও উপেক্ষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সমগ্র সংসার এক 'অদ্বিতীয়-জীবন-বিশিষ্ট', এইরূপ বিশ্বাসযুক্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ জীব ও জড়ের যে একতা সপ্রমাণ করেন, তাহা

* ইতিপূর্ব্বে ( প্রথম আহ্নিক, ৯ম পৃষ্ঠ ১০।১১শ পংক্তিতে ) অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বহুরূপে প্রকাশের নামই 'সংসার' বলা হইয়াছে, সুতরাং সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ ও ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই ; অর্থাৎ সমুদ্রে ও তাহার তরঙ্গে যেমন কোন প্রভেদ নাই, স্রষ্টা ও সৃষ্ট পদার্থেও তদ্রূপ। শাস্ত্রকারগণ মহাকাশ ও ঘটাকাশের সহিত জগদীশ্বর ও জীবের উপমা দিয়া থাকেন।

স্থিরচিত্তে শ্রবণ ও ধারণা করিতে পারিলে, আমাদের এই ভ্রান্ত সংস্কার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবন-নিদান বিশ্বজীবন জগদীশ্বরের অপরিসীম প্রেম ও অপার করুণার সুস্পষ্ট অসংখ্য নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া যে কিরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা যাঁহারা ঐকাগ্র্য-সাধন-দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কাহারও বুঝিবার অধিকার নাই।

উল্লিখিতপ্রকার জ্ঞানবান্ সাধন-নিরত ব্যক্তিগণ বলেন,—সংসার-বাসী জীব-সম্প্রদায়-মধ্যে কাহারও এমন কোনপ্রকার শক্তি নাই, যদ্দ্বারা তিনি অন্য কাহাকেও জীবন-বিহীন করিতে, অথবা তাঁহার নিজেরও জীবন ত্যাগ করিতে, পারেন। এরূপ কথা শুনিলে অনেকের মনে এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, যদি কোন মানব-শরীর-ধারী প্রাণী অস্ত্রাঘাত দ্বারা ছাগ শরীর-ধারী একটী প্রাণীর কণ্ঠচ্ছেদন করেন, তবে কি সেই ছাগ জীবন-বিহীন বা জড়াবস্থা প্রাপ্ত হইবে না?"

ইহার উত্তরে, উল্লিখিত মহাত্মগণ কহেন যে, ঐ ছাগকে দুই খণ্ড কি, সহস্র খণ্ড করিলেও কখনই উহা জীবন-বিহীন বা জড় হইতে পারে না। তবে অকর্ত্তিতাবস্থায় পূর্ণশরীরে উহার জীবনের যে পরিমাণে বিকাশ থাকে, ছিন্নাবস্থায় কেবল সেই বিকাশেরই হ্রাস হয় মাত্র; এবং ক্রমশঃ উহার চর্ম্ম, মাংস, অস্থি প্রভৃতি পদার্থকে যতই অধিক অংশে বিভক্ত করা যায়, উহার জীবনের বিকাশও ক্রমশঃ ততই হ্রাস হইয়া, পরিশেষে অতীব সঙ্কুচিত-জীবন পরমাণুরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কিছুতেই জীবনের অস্তিত্ব একেবারে লোপ হয় না।

জীবন যখন অতীব ক্ষুদ্র পরমাণুতে. অথবা ঐপ্রকার পরমাণু-সমষ্টি কোন স্থূল পদার্থে সূক্ষ্মভাবে ( বাহ্য চক্ষুর অগোচর ভাবে ) বাস করেন, তখন আমরা উহাঁর সূক্ষ্মতম বিকাশ বুঝিতে না পারিয়া ঐ পদার্থকে জীবন-বিহীন বা 'জড়' পদার্থ বলিয়াই অনুমান করি ; এবং এই ভ্রান্ত অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা জীবনের বিনাশ-বোধক 'মৃত্যু' নামক শব্দটীকে ভীষণ-ভাবে গ্রহণপূর্ব্বক ভয়ে অভিভূত হইয়া থাকি। এবং সেই বিকশিত-জীবন-বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের অবস্থান্তর-জন্য বিরহ-বেদনায় ব্যাকুল হইয়া থাকি। কিন্তু 'মৃত্যু' শব্দের প্রকৃত অর্থ জীবন বিনাশ নহে। যে ব্যক্তি ঐ শব্দ দ্বারা "জীবনের সঙ্কোচ বা নিষ্প্রভতাজনিত দেহের অবস্থান্তর" ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপার মনে করেন, তিনিই মাদৃশ আত্মবিস্মৃত বা অল্প বুদ্ধি জীব ; আর যিনি স্থিরভাবে চিন্তা দ্বারা আপনার অবিকশিত জীবনকে বিকশিত করিয়া আপনাকে ( আত্মাকে ) জন্ম ও মৃত্যুর অতীত বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ জীব, অথবা সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম ভগবান্ *। আহা, প্রাণ! কবে তুমি পূর্ণ বিকশিত হইয়া 'আমি' রূপে

---

* বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জগতের কোন পদার্থই নষ্ট হয় না। অগ্ন্যাদি দ্বারা কোন পদার্থ আপাততঃ বিনষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক উহা নষ্ট না হইয়া রূপান্তরিত হয় মাত্র। জগতে পদার্থের ন্যায় শক্তিরও ( আকর্ষণ-শক্তি, তাপ-শক্তি, জ্যোতিঃ-শক্তি, তাড়িত-শক্তি, শব্দ-শক্তি, শারীরিক-শক্তি, মানসিক-শক্তি প্রভৃতি শক্তিরও ) নাশ নাই। ইহারা এক অদ্বিতীয় মহাশক্তিরই রূপান্তর মাত্র। পদার্থ ও শক্তি, ইহারা উভয়েই অবিনশ্বর, এবং এক মহা-শক্তিরই বিকাশ। অতএব সেই আদি-শক্তিই পরব্রহ্ম ভগবান্, এবং এই বিশ্বই তাঁহার বিরাট রূপ।

আমাদিগকে দর্শন দিবে! কবে আমি আপনাতেই রমণ করিয়া আত্মারাম হইতে পারিব! না জানি সে কি অবস্থা!

---

# ষষ্ঠ আহ্নিক।

## জীবের আত্মবিস্মৃতিকালীন কর্ত্তব্য।

মানব-শরীর-ধারী মনুষ্যত্ব*প্রার্থী প্রাণীর সর্ব্বদা সর্ব্ব কার্য্যেই 'আমি কে?' এই চিন্তা অন্তঃকরণে জাগরূক রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি কার্য্যতঃ ইহা সাধনে সমর্থ হন, তাঁহার অভিলষিত পথে অগ্রসর হইবার ('মনুষ্য' হইবার) বিঘ্ন সমূহ অচিরে বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই মানব নিজ নিজ জীবনকে (বর্ত্তমান শরীরের সহিত প্রাণের বিকশিত অবস্থার সম্বন্ধ-কালকে) নিতান্ত সঙ্কুচিত (অল্পকাল-স্থায়ী) বলিয়া বুঝিতে পারেন। ইহা দ্বারা এই শুভ ফল উৎপন্ন হয় যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের জন্য (মৃত্যু বা শরীর হইতে প্রাণের বিকশিত অবস্থার বিচ্ছেদ-কালের জন্য) সতর্কভাবে প্রস্তুত থাকিতে হয়। সুতরাং তাঁহাকে সংসারে প্রাতর্মধ্যাহ্নাদি সকল সময়েই এমন সতর্ক হইয়া থাকিতে হয় যে, তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই যেন কোনপ্রকার দূষিত কার্য্য সাধিত হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট-বিষয় হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে। এইপ্রকার সতর্ক হইতে পারিলে সাংসারিক কোন প্রকার দুঃখযাতনা অথবা সুখা-

---

* 'মনুষ্যত্ব' কাহাকে বলে, তাহা জীবন-পরীক্ষার উপসংহারে সামর্থ্যস্বরূপ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

সক্তিই আর তাঁহাকে দৈহিক-নশ্বরতার চিন্তা ('আমি ত মৃত্যুর গ্রাসেই রহিয়াছি' এই চিন্তা) হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না; সুতরাং তদীয় অবশ্য কর্ত্তব্য—আরাম বা মনুষ্যত্ব প্রার্থনা, হইতেও বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না।

আমাদের 'আপনারই' (নিজ আত্মারই) নিকট এই আরাম বা মনুষ্যত্ব প্রার্থনা করিতে হয়; কিন্তু যতদিন আমরা আমাদের 'প্রকৃত আপনাকে' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-নিদান আদ্যন্ত-বিরহিত ভগবান্ পরমেশ্বরকে, চিনিতে না পারি, ততদিন আমরা, আমাদের 'অবিকশিত আপনাকেই'—নিজের আনন্দো দ্দীপক, ভগবানের কোন নামে—পূজা, আরাধনা, ধ্যান প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা আপনাতেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। ফলতঃ যে কোন উপায়েই হউক, 'আপনার' বিকাশ-সাধনই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য; এবং এই কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্তই আত্মচিন্তানিরত ঋষিগণ প্রাতর্মধ্যাহ্নাদি দিবসের সন্ধিকালত্রয়ে স্থিরভাবে ও পবিত্রমনে ভগবানের উপাসনায় নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত আমাদিগকে 'আহ্নিক-ক্রিয়া' নামে একটী কার্য্য অনুষ্ঠানের আদেশ করিয়া গিয়াছেন; এবং উহা আমাদের পরম-কল্যাণ-জনক কার্য্য বলিয়া উহাতে উদাসীন হইলে অপরাধ হয় বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমরা ঐ পরম-মঙ্গল-কারিণী ক্রিয়াকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছি। যদিও আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অদ্যাপি ঋষিগণের আদিষ্ট কার্য্য সাধন (মহাজনগণ-প্রকাশিত মন্ত্রাদি উচ্চারণ) করেন, কিন্তু তন্মধ্যে অনেকেই 'স্থির ভাব' ও 'নির্ম্মল মন' এই উভয়েরই অভাবে তন্নিত্ত [illegible]

রসাস্বাদে ও আনন্দলাভে বঞ্চিত হন। ফলতঃ আধুনিক বাহ্য আহ্নিক-ক্রিয়া-শীল প্রায় অনেক ব্যক্তিই পরম শুভ-ফল-প্রসবিনী আহ্নিক-ক্রিয়াকে 'লোকাচার' অথবা ধার্ম্মিকতা-প্রদর্শনের উপায় রূপে ব্যবহার করিয়া, ভগবদনুরক্ত ব্যক্তির নিকট কেবল আপনাদের আন্তরিক শক্তিহীনতারই পরিচয় দেন মাত্র।

শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিবর্গের নিকট শুনা যায়, পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ * অরুণোদয় কালে (সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব্বে) শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নানাদি দ্বারা শারীরিক পবিত্রতা সম্পাদনের সহিত আন্তরিক স্ফূর্ত্তি লাভানন্তর পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ হইলেই (ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে) আপনাদের প্রাতরাহ্নিক-ক্রিয়া (প্রাতঃকালীন ভগবদুপাসনা) আরম্ভ করিতেন। পরে যখন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইত, তৎপূর্ব্বেই প্রাতরাহ্নিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার মধ্যাহ্নাহ্নিক-ক্রিয়ায় নিযুক্ত হইতেন। এইরূপে মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে পর, দিবসের অষ্টম ভাগে † তাঁহারা 'ধর্ম্ম' বা 'আত্মজ্ঞান' লাভের সহায়, অথবা মনুষ্যত্ব-রক্ষার আধার, শরীরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কর্ত্তব্য (আহারাদি) কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন। অনন্তর জ্ঞানপ্রার্থী, আত্মান্বেষণে অসমর্থ, ব্যক্তিগণকে যথোচিত উপদেশপ্রদানাদি কর্ত্তব্য সকল সম্পাদনে সায়ংকাল

* সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম ভগবানে বিশ্বাসী, ভক্তিমান্ ও তাঁহার উপাসনাশীল মহাত্মগণই প্রকৃত 'ব্রাহ্মণ'-পদবাচ্য।

† দিবসকে ১৫ ভাগে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগের পরিমাণ এক মুহূর্ত্ত (প্রায় ৪৮ মিনিট) হয়। এইরূপ সাত মুহূর্ত্ত অতীত হইবার পর যে সময় আইসে, তাহাই অষ্টম মুহূর্ত্ত বা দিবসের অষ্টম ভাগ। ইহা মধ্যাহ্নের (১২ টার) এক দণ্ড (প্রায় ৪৮ মিনিট) পূর্ব্ব ও এক দণ্ড পরবর্ত্তী সময়।

পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিতেন। পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলেই (সূর্য্যের অস্তগমন-কালেই অথবা রৌদ্র মুহূর্ত্তে) পুনর্ব্বার সায়ংকালীন আহ্নিক-ক্রিয়ায় নিবিষ্ট হইয়া, রাত্রির প্রথম প্রহরের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার পর, আশ্রমের অন্যান্য কর্ত্তব্য সাধনানন্তর প্রশান্তচিত্তে পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! এখন আমরা এমন আহ্নিক-ক্রিয়াকে (যদি করিতেই হয়, তবে) দুইবার কোশাকুশীর শব্দের সহিত মন্ত্রপাঠমাত্র [illegible] শেষ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে শিখিয়াছি।

[illegible]-শরীর-ধারণ করিয়া আমাদের এই প্রধান কর্ত্তব্য-[illegible]দৃশ ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞা প্রকাশের কারণ, [illegible]বিধির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি-হীন[illegible] বোধ হয়, আর কিছুই নহে। পুরাকালীন ব্রাহ্মণ[illegible] হৃদয়বান্, সংস্কার-পূত ও সংস্কৃতভাষা-ভিজ্ঞ ছি[illegible] সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত ঋষিবাক্য বা মন্ত্রের ভাবে[illegible]সহই আপনাদের হৃদয়ের ভাব মিলাইয়া আগ্রহের স[illegible]র উপাসনা করিতে পারিতেন; এবং তাহাতেই আ[illegible]রিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যথাবিধি সংস্কারাভা[illegible]য়ে আমাদের চিত্ত আত্মানুসন্ধানপরাঙ্মুখ সুতরাং [illegible]চিত হওয়ায় আমরা অনেকেই ঐ সংস্কৃত শব্দ সকল প্রায় বুঝিতেই পারি না, আর যদিবা কাহারও নিকট হইতে কথনও উহার অর্থ জানিয়া লই, তথাপি উহার অন্তর্নিহিত মহা-ভাব-সমূ[illegible]ণা করিবার শক্তি আমাদের নাই বলিয়াই আ[illegible] হয় না।

## প্রত্যুষকালীন কর্ত্তব্য

### (প্রাতরাহ্নিক-ক্রিয়া)।

অতি প্রত্যুষে ( ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ) জাগরিত হওয়া, আমাদের দিবাভাগের প্রথম কর্ত্তব্য। ইহাতে শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ থাকে; এবং সমস্ত দিবালোক-মধ্যে অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায় বলিয়া, শীত গ্রীষ্মাদি সর্ব্বকালের দিন-মানই দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রা-ভঙ্গ হইলেই তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। নিদ্রা-ভঙ্গের পর কিছু-কাল শয্যায় শয়ান থাকিয়া, অভীষ্টদেব ভগবান্‌কে স্মরণ ও প্রণামানন্তর, সেই দিনের মধ্যে আমাদের করণীয় কি কি ব্যাপার আছে, তদ্বিষয়ক চিন্তা করা কর্ত্তব্য। তাহার পর, *সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ধীরে ধীরে শয্যা পরিহার-পূর্ব্বক* প্রথমতঃ শীতল জল দ্বারা মুখমণ্ডল প্রক্ষালনাদি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করণানন্তর, শরীর সুস্থ থাকিলে স্নান, নতুবা রাত্রি-পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ, করা কর্ত্তব্য। স্নানাদি করিবার জন্য যদি অনতিদূরস্থিত নদী, দীর্ঘিকা প্রভৃতি কোন জলাশয়ে যাইবার সুবিধা হয়, তবে তাহাতে আলস্য করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, উহা দ্বারা দুইটী মহোপকার সাধিত হয়। প্রথম,—প্রাতঃকালীন নির্ম্মল ও শীতল সমীরণ সেবনদ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হয়; এবং দ্বিতীয়,—পূর্ব্বদিনের পরিহিত বস্ত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৌত বসন পরিধান, এবং মনোহারিণী প্রকৃতির প্রভাত-কালীন শোভা সন্দর্শন, দ্বারা অন্তঃকরণেরও অনির্ব্বচনীয় স্ফূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপে উল্লিখিত ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়া, জলাশয়-তীরে, পুষ্পোদ্যানে, প্রান্তরে, অথবা যে স্থান হইতে অনায়াসে সূর্য্যোদয় দর্শন হয়, এইরূপ কোলাহলশূন্য গৃহে, উপবেশনপূর্ব্বক স্থির ভাবে লোহিত বর্ণ পূর্ব্বাকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রকৃতি-প্রিয় পক্ষিগণের প্রাতঃকালীন সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিলে কিয়ংক্ষণের মধ্যেই আমাদের চিত্ত আরামপূর্ণ এক অভিনব রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয়। তখন যে আমাদের কিরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা ভাষা দ্বারা কাহাকেও বুঝাইতে পারা যায় না। কিন্তু উল্লিখিত প্রকারে উপবেশন করিয়াও এমন সতর্ক ভাবে থাকিতে হইবে, যেন চিত্ত আলোচ্য বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতে না পারে, কেন না তাহা হইলে আরামের পরিবর্ত্তে অশান্তিই উপস্থিত হইয়া থাকে।

মনের উল্লিখিত প্রকার প্রশান্ত অবস্থায় এরূপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, যদ্দ্বারা আমাদিগের 'আপনাকে' নিতান্ত হীন ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া ধারণা জন্মে; আমাদের আচরিত অসংখ্য কদাচারজনিত অনুতাপ, যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিতে থাকে; এবং বিবেকও সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া আমাদিগকে আরামের পথে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলেন। সচ্চিন্তাশীল বা সাধনাভিলাষী ব্যক্তিগণ এ অবস্থা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

স্থিরাসনে কিয়ংক্ষণ এই অবস্থায় অতিবাহিত হইলে পর, আমরা ক্রোনক্রমেই আর ঐরূপ জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, শান্তির আশায় আমরা শান্তিময় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে বাধ্য হই।

চিত্তের এইরূপ ব্যাকুল অবস্থায়, আমাদের, ভগবান্‌কে কোন কথা বিবেচনা করিয়া বলিবার শক্তি থাকে না; অর্থাৎ অনুতাপের জ্বালায় ও বিবেকের উত্তেজনায় অস্থির হইয়া শান্তি পাইবার জন্য যে তাঁহাকে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলি, তখন তাহার বিচারের সামর্থ্য থাকে না; এবং পরে তাহা প্রায় স্মরণও থাকে না। সে সময় বহিরিন্দ্রিয়ের শক্তি যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়। তবে, প্রকৃতভক্তিসম্পত্তিহীন মাদৃশ ব্যক্তিগণের আন্তরিক আরামলাভের নিমিত্ত, করুণহৃদয় মহাজনগণের উপদেশমত, প্রাতঃসময়ে শান্তি-বিধাতা ভগবান্‌কে এইরূপে উপাসনা করিলে অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

## প্রাতরুপাসনা-মন্ত্র।

হে চৈতন্যস্বরূপ! আরাম-দায়িনী রজনীতে আমি তোমার শান্তিময় অঙ্ক-শয়নে অকাতরে নিদ্রিত ছিলাম, এখন তোমারই ইচ্ছানুসারে জাগরিত হইয়া, তোমার অনুপম করুণারাশির অভিনব বিকাশ সন্দর্শন করিতেছি। আহা! প্রকৃতিদেবী যেন অননুভূতপূর্ব্ব মৃদুমধুর-সঞ্চারী সমীরণ-চ্ছলে হাসিতে হাসিতে, কুসুম-সৌরভ-সংলিপ্ত অনতিধূসরবর্ণ রমণীয় উত্তরীয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক, বিহগকুলের মনোরম কলরবচ্ছলে প্রাণ-শান্তি-কর বিভাস রাগিণী আলাপদ্বারা সমগ্র প্রাণীকেই তোমার প্রাতঃকালীন মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য জাগরিত হইতে আহ্বান করিতেছে। কিন্তু হে আনন্দস্বরূপ! আমি আত্ম-বিস্মৃতি-বশতঃ প্রকৃতির এই হিতকর উপদেশ পরিপালনে উদাসীন হই কি না, যেন অলক্ষিতভাবে তাহাই জানিবার

নিমিত্ত,—অথবা তোমার যে ভক্ত মঙ্গলদায়িনী প্রকৃতি-দেবীর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া প্রত্যূষ সময়েই তোমার মহিমা-দর্শনে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখাইবার নিমিত্ত,—তুমিই ভুবনমোহন-বেশধারী প্রাতঃসূর্য্য-রূপে হাসিতে হাসিতে প্রকাশিত হইতেছ!

দীনবন্ধো! যে ভাগ্যবান্ তোমার কৃপায় দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া তোমার এই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিকে নিজ আত্মার সহিত নিরন্তর অভিন্নরূপে দেখিবার শক্তি পাইয়াছেন, তিনিই জানিতে পারিয়াছেন যে, তুমি কে? এবং তিনিই নিজ-কর্ত্তব্য-গতি-পালনে সমর্থ হন। কিন্তু আমি ত মোহাবরণ-হেতু তোমাকে সতত দেখিতে পাই না। অতএব তুমি আমাতে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকিয়া আমার এই মোহ-জাল বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও! হে অনন্তশক্তে! তুমি আমার তুচ্ছ অভিমানকে ধ্বংস করিয়া,—শরীর ও মনের সকল শক্তি সংহরণ করিয়া,—আমাকে এরূপ অবস্থা প্রদান কর, যাহাতে আমি সংসারের সকল প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারি। হে শান্তিময়! তুমি আমার অন্তরে নিরন্তর জাগরিত থাকিয়া, উহার দূষিত কামনা ও নিকৃষ্ট ভাব সকলকে বিদূরিত করিয়া দাও, এবং আমার আচরিত সকল কার্য্যকেই তোমার সহিত মিলনের সহায় কর! আমি যেন এমন কোন কার্য্যে লিপ্ত না হই; এবং এমন চিন্তাকে মনে স্থান না দিই, যদ্দ্বারা তোমার এই পূর্ণ-প্রসন্ন ভাব অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয়।

হে প্রাণেশ্বর! শুনিতে পাই, তোমার শরণ ব্যতিরেকে আমার আরাম বা শান্তি লাভের আর অন্য কোন উপায়

নাই; কিন্তু কিরূপে যে তোমার শরণাপন্ন হইতে হয়,—কি করিলে যে তোমার প্রসাদ লাভ করা যায়,—আমি যে ভাবিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি না! অতএব হে আনন্দময়! আমি এই পবিত্র প্রাতঃসময়ে তোমার নিকট এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি যেমন এখন আপনার পরিপূর্ণ প্রসন্নতা প্রদর্শন দ্বারা তোমারই শক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিকে অভিনব রাগে রঞ্জিত ও স্ফূর্ত্তিমতী করিয়াছ, আমার সর্ব্বাঙ্গীন সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার অন্তর্নিবাসিনী মোহমলিনা প্রকৃতিকেও তোমার শক্তি প্রদানপূর্ব্বক সেইরূপ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট ও পবিত্র রাগে রঞ্জিত করিয়া দাও! আমি যেন তোমার প্রকৃতির উপদেশ সকল শিরোধার্য্য করিয়া, তোমারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া, আরামের সহিত আজিকার দৈনিক কার্য্যকলাপ সম্পাদনে সমর্থ হই।

(প্রণাম।)

---

# সপ্তম আহ্নিক।

## মধ্যাহ্নকালীন কর্ত্তব্য

### (মধ্যাহ্নাহ্নিক-ক্রিয়া)।

এইরূপে প্রাতঃকালীন ভগবদুপাসনা সম্পন্ন করিয়া আমাদের সাংসারিক যে সকল কার্য্য থাকে, তাহা বিশেষ বিবেচনার সহিত সম্পাদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, যতদিন কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি থাকে,—অথবা কোন প্রকার

কার্য্যাদি দ্বারা অর্থার্জ্জন না করিলে নানাবিধ অভাবজনিত বেদনা পাইতে হইবে এইরূপ বিবেচনা হয়,—ততদিন কার্য্যে অযত্ন করিলে অপরাধ জন্মে। ফলতঃ অবস্থানুসারে যেরূপ কার্য্যই উপস্থিত হউক না কেন, অভিমানশূন্য হইয়া যত্ন ও মনোযোগের সহিত তাহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্বদাই এরূপ সতর্ক থাকা উচিত, যেন কোনপ্রকার অন্যায় (আরাম-বিরুদ্ধ) কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়।

এইরূপে কার্য্য করিতে করিতে যখন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইবে, তখন শরীর ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত, কার্য্য হইতে কিয়ৎক্ষণ অবসর লইয়া, * মনুষ্যত্ব-প্রাপ্তির নিমিত্ত এইরূপে ভগবানের উপাসনা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

## মধ্যাহ্নোপাসনা-মন্ত্র।

মা বিশ্বপ্রসবিনি পরমেশ্বরি! আমি প্রত্যূষ-সময়ে তোমার প্রকৃতিকে তোমারই প্রদত্ত মনোরম সজ্জায় সুসজ্জিতা দেখিয়া যেমন আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, এই মধ্যাহ্নসময়ে প্রখর-জ্যোতির্ম্ময় প্রভাকর-কিরণে সেই প্রকৃতির উজ্জ্বলতর অথচ রমণীয় পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণে ততোঽধিক আনন্দের উদয় হইতেছে। আহা! এই অশেষ-সঙ্কট-নিলয়

---

* অনেকেই মধ্যাহ্নকালে কার্য্য (পরের দাসত্বাদি) হইতে অবসর পাওয়া দুর্ঘট বলিয়া আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বিষয়ে এইমাত্র বক্তব্য যে, উপাসনা আন্তরিক কার্য্য; যদি অন্তর বিশুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে আর মৌখিক উপাসনাদির তত প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যাঁহাদের তাহা না থাকে, অথচ যাঁহারা মধ্যাহ্নে একবারেই অবসর না পান, তাঁহাদের ঐ সময় ব্যতীত আর সকল সময়েই (প্রাতঃ ও পরাহ্নে) উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

সংসার-মধ্যে, আমি তোমার কৃপা-প্রদত্ত দিব্যচক্ষুঃ দ্বারা যখনই দেখিবার শক্তি পাই, তখনই বোধ হয় এই মর্ত্ত্যধামে তোমার অপরিসীম করুণা-লতায় নিত্য-শান্তি-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া, উহার দিব্য-সৌরভ-বিকিরণ দ্বারা, আমারও অকৃতজ্ঞ প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে।

মা করুণাময়ি! আমি মধ্যাহ্নসময়ে অনায়ত্ত মনের মন্ত্রণায় অসার-কার্য্য-শৃঙ্খলে সম্বদ্ধ হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে অবিরাম ভ্রমণ করিতে করিতে, যখন শ্রান্তিবশে অবসন্ন হই, তখনই তোমার অপরিসীম-করুণাপূর্ণ বিশ্ব-লীলা দর্শনের প্রবৃত্তি জন্মে। তখন মা! কি জনপরিপূর্ণ রমণীয় নগর,—কি মানবপরিশূন্য ভীষণ অরণ্য,—কি সুদর্শন শস্যক্ষেত্র,—কি বিচিত্রদৃশ্য শৈলশিখর, সকল স্থানের সকল পদার্থই যেন আনন্দ-ভেরী-নিনাদ-দ্বারা তোমারই প্রেমসঙ্গীত গান করিতেছে, শুনিতে পাই!

মা বিশ্বজননি! এই মধ্যাহ্নসময়ে সংসার-মন্দিরমধ্যে তোমার করুণাময়ী বিশ্বেশ্বরী—অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, তোমার সন্তান (প্রাণি) গণ, কেমন হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে তোমার সংসারের কার্য্য সাধন করিতেছে! দেখিলে বোধ হয় যেন, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় প্রাণিগণও উৎসাহসহকারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য-সাধন-দ্বারা তোমারই সেবায় তৎপর রহিয়াছে।

বিশ্বেশ্বরি! কে তোমার অসীম করুণাশক্তির ইয়ত্তা করিতে পারে—মা! তুমি কি কৌশলে ও কত যত্নে যে আমাদিগকে পালন করিতেছ, আমরা মোহাভিভূত হইয়া তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিব? আহা! এই পবিত্র মধ্যাহ্নকালে তুমি আমাদিগকে ক্ষুধিত দেখিয়া, তোমার সকল-পদার্থপরিপূর্ণ সুবিশাল

ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক, এই সংসার-পান্থ নিবাসের সকল অভাবই মোচন করিতেছ। এখানে জ্ঞানবান্ অজ্ঞান, ধনবান্ দরিদ্র, বলবান্ দুর্ব্বল, সকলেই ব্যগ্রভাবে আতিথ্য স্বীকার করিতেছে, এবং তুমিও সকলকেই সমভাবে ও সমান যত্নে পরিবেশনপূর্ব্বক * তাহাদের ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতেছ। মা! তোমার এই মঙ্গলোৎসব-পরিপূর্ণ পান্থ-নিবাস-মধ্যে, তোমারই জাজ্বল্যমান বাৎসল্য-ভাব সন্দর্শন করিয়াও, যে মোহ-নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত না হন,—এই প্রখর সূর্য্য-রশ্মি-রূপ তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য-দর্শনে তোমার শরণাপন্ন না হন,—এমন সর্ব্বজন সুলভ পান্থ-নিবাসে তোমার নিজ-কর-প্রদত্ত তোমারই মহা-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ না করেন, তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ মানব-শরীর-লাভ নিরর্থক মাত্র।

মা অন্তর্যামিনি! আমার মোহাভিভূত অন্তরের অবস্থা তুমি ত সমস্তই জান! 'আর কদাচার করিব না' সঙ্কল্প করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা কতই গুরুতর কুকর্ম্ম করিতেছি, তাহাও ত তুমি দেখিতেছ! মোহান্ধকারে পড়িয়া তোমার প্রদর্শিত আরাম-পথ-দর্শনে আমি যে অসমর্থ হইয়াছি,

---

* ভগবান্ সমস্ত প্রাণীকেই সমভাবে আহার্য্য প্রদান করিয়া থাকেন। সেই জন্য রাজা তাঁহার রাজভোগে যেমন তৃপ্ত হন, ভিক্ষুকও তাহার ভিক্ষার্জ্জিত, উপকরণাদি-বিরহিত, মুষ্টিমেয় কদন্নেও সেইরূপ তৃপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মাদৃশ মোহান্ধ প্রাণিগণ আপনাদের কলুষ-বিরস-রসনায় উহার প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণ করিতে না পারিয়া, ভগবদ্দত্ত প্রসাদস্বরূপ ঐ অমৃতময় ভোজ্য পদার্থকেই কটু, তিক্ত, কষায়াদি বোধে তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারে না।

তাহাও ত তুমি দেখিতে পাইতেছ! এ অবস্থায় কদাচারী বলিয়া তুমি যদি এ অধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত না কর, তবে আর কাহার কাছে ক্লেশ জানাইব—মা!

দয়াময়ি! আমার যাহা কিছু প্রকৃত প্রয়োজন তাহা ত তুমি সকলই দিয়াছ—মা, অধিক আর কি প্রার্থনা করিবার আছে! তবে এই প্রার্থনা করি,—প্রাতঃকালাবধি এই সময় পর্য্যন্ত আমি অকারণে অথবা সামান্য কারণে যে সকল প্রাণীর প্রাণে বেদনা দিয়া অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য এবারও তুমি আমাকে ক্ষমা কর! এবং এরূপ শক্তি প্রদান কর, যাহাতে আমি এখন হইতে আমার অনায়ত্ত ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্তাধীনে রাখিতে পারি। আর মা! তুমি আমাকে যেমন ভাল বাস, আমিও যেন সকল প্রাণীকে সেইরূপ ভাল বাসিতে পারি,—আমাকে এরূপ প্রেম প্রদান কর! এবং সকলের প্রাণের সহিত আমাকে এমনভাবে সম্বদ্ধ করিয়া দাও, যাহাতে 'আমি সকলের সহিত অভিন্ন' বুঝিয়া সকলেতেই তোমাকে দেখিতে পাই। মা! আমার সুখ সম্পদ্ সকলই ত তুমি! তোমাকে পাইলেই ত আমার সকল ক্লেশের অবসান এবং সকল বাসনাই পরিপূর্ণ হয়! মা ব্রহ্মময়ি! তুমি আমার প্রাণে সর্ব্বদা এরূপে প্রকাশিত থাক, যাহাতে আমি নিরন্তর তোমার আনন্দময়ী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে উন্মত্ত থাকিতে পাই। তুমি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর; আমি তোমার চির শান্তি-প্রদ শ্রীপদপল্লবে প্রণত হইলাম।

( প্রণাম )

—*—

# অষ্টম আহ্নিক।

## সায়ংকালীন কর্ত্তব্য

### ( সায়মাহ্নিক-ক্রিয়া )।

মধ্যাহ্নকালের কর্ত্তব্যসমূহ সাধন করিয়া, আমাদের শারীরিক, পারিবারিক ও সামাজিক যে কিছু কার্য্য থাকে, তাহা যত্নসহকারে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ( অপরাহ্লে ) চিত্তকে সাংসারিক চিন্তা হইতে বিরত * করিয়া সূর্য্যের অস্তগমন-সময়ে (রৌদ্র মুহূর্ত্তে বন, উপবন, নদীতীরাদি নির্জ্জন ও অনাবৃত স্থানে গমনপূর্ব্বক প্রকৃতির সায়ংকালীন মনোহারিণী মূর্ত্তি সন্দর্শন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ, এবং চিত্তেরও স্ফূর্ত্তি ও স্থৈর্য্য লাভ হইয়া থাকে।

এই অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে অবস্থানের পর, মন যখন একচিন্তানিরত হইবার উপযুক্ত হন, তখন আরাম বা মনুষ্যত্ব প্রার্থনার জন্য আনন্দময় ভগবান্‌কে এইরূপে উপাসনা করিলে অভীষ্টলাভ হইয়া থাকে।

### সায়মুপাসনা-মন্ত্র।

হে চৈতন্যস্বরূপ! আমি প্রাতঃকালে রমণীয় প্রাতঃ-সূর্য্যরূপে তোমার প্রকাশ সন্দর্শনাবধি, প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার

---

* প্রথমে চিত্তকে সাংসারিক চিন্তা হইতে বিরত করিবার জন্য অভ্যাস করিলে, অল্পকালের মধ্যে উহা আপনিই সংযত হইয়া দিবসের সন্ধিকালত্রয়ে কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত হইবে।

মহাশক্তির সাহায্যে তোমারই সংসারের বিবিধ-কার্য্য-সাধনার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্ত হওয়ায়, এখন তোমার শরণাপন্ন হইলাম; তুমি আমাকে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় দাও। হে অখিলশরণ! এই পবিত্র সন্ধ্যা-কালে তোমার সংসারের যে দিকে আমার দৃষ্টিপাত হইতেছে, সেই দিকের সকল প্রাণীকেই আপন আপন কার্য্য ত্যাগ করিয়া আরাম-লাভের জন্য আপনাদের আশ্রয়াভিমুখে যাইতে দেখিতেছি। শূন্যে বিহগদল,—প্রান্তরে গাভী-দল,—লোকালয়-পথে পথিক মানব-দল,—এইরূপ প্রায় কোন প্রাণীই আর এ সময় নিরাশ্রয় হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। তবে হে সর্ব্বাশ্রয়! আমি এরূপ নিরাশ্রয় হইয়া,তোমার আশ্রয়লাভের পথ ভুলিয়া, আর কতকাল এ ভাবে থাকিব—নাথ! রিপুদলের নিদারুণ উত্তেজনায়,—দুস্তর বিষয়-তৃষ্ণার যাতনায়,—এবং অশান্তির নিরন্তর তাড়নায়,—আমি যে জর্জ্জরীভূত হইতেছি, তাহা ত তোমার অবিদিত নাই! অতএব হে অন্তর্যামিন্! তুমি প্রসন্ন হইয়া, তোমার আরামময় শ্রীচরণ-চ্ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দাও,—আমি সকল যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি।

মা জগদ্ধাত্রি! তোমার যে ভাগ্যবান্ সন্তান প্রশান্তমনে অন্তশ্চক্ষুদ্বারা তোমার এই পবিত্র প্রদোষ-প্রতিমাকে দেখিতে পান, না জানি তাঁহার অন্তরে কি আনন্দেরই উদয় হয়! আহা! এমন প্রশান্ত সময়ে, কৃতজ্ঞহৃদয়ে, দুই বিন্দু অশ্রু দিয়া, মা, আমি তোমার পূজা করিতে পারিলাম না, কিসে আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে বল! তোমার নির্ম্মল সুশীতল কৃপা-প্রস্রবণে আমি একবারও অবগাহন করিতে পারিলাম না।

তোমার প্রদত্ত দিব্যজ্ঞানামৃত—মহাপ্রসাদ—আমি একবারও গ্রহণ করিতে পারিলাম না, কিসে আমার ভব-ভার-বিশীর্ণ শরীর, ও শত্রু-সংপীড়িত প্রাণ, শান্ত হইবে বল! সমস্ত দিন পার্থিব চিন্তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি যে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি; এই সময় তুমি একবার কোলে তুলিয়া না লইলে আর কিসে আমার এ জ্বালা জুড়াইবে বল মা!

"হরি হে! কে তোমার অপরিসীম করুণার ইয়ত্তা করিতে পারে—দয়াময়! পক্ষী যেমন পক্ষযুগল বিস্তার করিয়া নিজ-শাবকগুলিকে বিঘ্ন বিপত্তি হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করে, সুবিশাল বিশ্ব প্রসব করিয়া তুমিও সেইরূপ আমাদিগকে কোলে লইয়া অসংখ্য বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতেছ! মোহ-বশে ও রিপু-পীড়নে পাপকার্য্যে রত হইয়া, আপনাকে মলিন ও তোমা হইতে দূরবর্ত্তী বিবেচনায় আমি যখনই কাঁদিয়াছি, তখনই তুমি আমার অন্তরে প্রকাশিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-তরঙ্গে আমার প্রাণের মালিন্য ধৌত করিয়া দিয়াছ। কিন্তু হে প্রাণেশ্বর! দেখিতে দেখিতে আমার সে অনুতাপাশ্রু যে কিরূপে শুকাইয়া যায়, তোমাকে যে কোথায় হারাইয়া ফেলি, তাহার ত কিছুই ঠিকানা করিতে পারি না!

হে অনন্তশক্তে! তুমি দিবাভাগে আমাকে যেরূপ নানা বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়াছ, সেইরূপ এই রজনী-সমাগমে নিদ্রাকালীন অসহায় অবস্থায় আমার শরীর, মন ও প্রাণকে সকল বিঘ্ন ও অশান্তি হইতে রক্ষা কর! আমার সংসার-সাগরের তরণী তুমি,—ক্লেশ-হুতাশনের শান্তি-সলিল তুমি,—অন্ধ নয়নের মণি তুমি,—আমি জগতে 'আমার'

বলিয়া যে কিছু বস্তুতে অভিমান করি, সে সমস্তই তোমাকে সমর্পণ করিলাম, তুমি শরণাগতকে রক্ষা কর।

( প্রণাম। )

যে ব্যক্তি প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন কালে উল্লিখিত-প্রকারে ভগবানের নিকট দিন কৃত-নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থনানুযায়ী সদাচার করিতে অভ্যাস করেন, অতি অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার অন্তরে শান্তি (শম-ভাব) উপস্থিত হয়; এবং রিপু-দমন-শক্তিতেও (দম-ভাবেও) ক্রমশঃ তাঁহার অধিকার জন্মে।

এই শম দম প্রভৃতি আয়ত্ত হইলেই, মানব-শরীর-ধারী প্রাণী হৃদয়ে সচ্চিদানন্দময় ভগবানের ভাব ধারণাদ্বারা সকল সদ্‌গুণেই ভূষিত ও 'মনুষ্য' নামের যোগ্য হন; এবং 'সাধু' বা 'ধার্ম্মিক' রূপে আমাদের নিকট পূজ্য হইয়া থাকেন। তাদৃশ ব্যক্তিই 'বিস্মৃতির' হস্ত-মুক্ত হইয়া তাঁহার 'আপনাকে' (নিজ আত্মাকে) দেখিতে পান; এবং এই স্থূলশরীরে থাকিয়াই নিরন্তর আনন্দ ভোগ করেন।

সে যাহা হউক, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের ন্যায় আত্ম-বিস্মৃত ব্যক্তিগণের আত্ম-স্মৃতির জন্য উল্লিখিত-প্রকারে প্রত্যহ প্রশান্তচিত্তে ও পূতভাবে ভগবানের উপাসনা না করিলে চৈতন্য বা জ্ঞান লাভের আর উপায়ান্তর নাই। ইহাই আমাদের 'দৈনিক কর্ত্তব্য।'

# নবম আহ্নিক।

## সাময়িক কর্ত্তব্য।

সংসারে বাস করিয়া মাদৃশ আত্মবিস্মৃত ব্যক্তিগণ সুখ দুঃখ, বা বিপদ্ সম্পদের হস্তে সর্ব্বদাই পতিত হইতেছেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন যে সুখ ও দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। ফলতঃ আমরা সুখ-দুঃখের স্বরূপোপলব্ধি করিবার শক্তির অভাব-বশতই সাংসারিক অতি সামান্য অভাবকেই 'দুঃখ' বা 'বিপদ্', এবং উহার নাশকেই 'সুখ' বা 'সম্পদ্', বলিয়া মনে করি। এবং যখন ঐ প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হয়, তখন সদসৎ যে কোন প্রকারে পারি, উহা দূরীকরণের নিমিত্ত ব্যাকুলও হইয়া থাকি।

আমরা সচরাচর মনে করি যে, কোনক্রমে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলেই আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে; এবং তজ্জন্য বিবিধপ্রকারে চেষ্টা ও অনেক সময় কাতরভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনাও করিয়া থাকি। কিন্তু যদি একবার কোন উপায়ে ঐ অর্থ হস্তগত হয়, তবে উহার সদ্ব্যবহার-বিষয়ে অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত যথেচ্ছাচারী হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগও করিয়া থাকি।

এখন আমাদের সাধারণতঃ এই প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে যে, অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইলেই আমরা সত্যকে একবারে পরিত্যাগ, ও সেই অর্থের বিনিময়ে অশেষ অনর্থ সঞ্চয়, করিয়া থাকি। বিশেষতঃ যদি আমরা যৌবনকালে অর্থের অধিকারী হই, তাহা হইলে একে ত আমরা যৌবনকালীন-কর্ত্তব্য-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার অর্থপ্রাপ্তি-হেতু

অভিমানে অন্ধ হইয়া আমাদের সকল শুভ বৃত্তিকেই নিস্তেজ করিয়া ফেলি। অতএব বিপদ্, সম্পদ্, যৌবন প্রভৃতি সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি, অর্থাৎ ঐ সকল সময়ে ভগবানের নিকট আমাদের কিরূপে প্রার্থনা করা উচিত, ক্রমশঃ তাহাই প্রকাশিত হইতেছে।

## বিপৎকালীন প্রার্থনা।

হে প্রাণবন্ধো! সুখ, দুঃখ, সম্পদ্, বিপদ্, সকল সময়েই তুমি আমার সঙ্গে রহিয়াছ; কিন্তু আমি মোহান্ধতাবশতঃ তাহা বুঝিতে না পরিয়াই বিপদে এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। অতএব হে শান্তিময়! তুমি আমাকে এই সময় এরূপ ধৈর্য্য প্রদান কর, যদ্দ্বারা আমি উপস্থিত বিপদে একেবারে অভিভূত না হই; এবং এই বিপদের মধ্যেও যেন তোমার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে পারি। হে মঙ্গলনিধান! যখন এই স্বার্থপরতাময় সংসার মধ্যে নিঃস্ব হইয়া আমি আপনাকে বন্ধুবিবর্জ্জিত দেখিয়া ব্যথিত হই, তখন যেন কেবল তোমারই স্নেহময় বাহুযুগল আমাকে বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গন করিতেছে দেখিতে পাই। হে পরমধন! তুমি আমাকে এরূপ সহিষ্ণুতা প্রদান কর, যদ্দ্বারা আমি তোমাতে নির্ভর করিয়া সাংসারিক সকলপ্রকার অভাবই অকাতরে সহ্য করিতে পারি।

হে বিপত্তারণ! তুমি আমাকে দুঃসহ শোক, মোহ ও আসক্তি জনিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। তোমার অমৃত-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া আমার হৃদয়-কন্দরস্থিত ক্লেশ-তিমিরকে অচিরাৎ

বিদূরিত কর; এবং আমার প্রাণকে চিরকাল তোমাতেই আসক্ত রাখ। প্রভো! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব; অতএব আমাকে তোমার প্রেম-গুণে এমন দৃঢ়রূপে আবদ্ধ কর, যেন আমি আর বিপদ্‌রূপ কোন সামান্য আঘাতে বিচলিত না হই।

(প্রণাম।)

---

## সম্পৎকালীন প্রার্থনা।

হে সর্ব্বশুভপ্রদাতঃ পরমেশ্বর! তোমার অসীম করুণায় আমি প্রভূত সম্পদের অধিকারী হইয়াছি; কিন্তু এই সময় তুমি আমাকে এমন সামর্থ্য প্রদান কর, যাহাতে আমি সম্পদ্-মদে প্রমত্ত ও বিষয়-লাভে বিমোহিত না হই। প্রভো! আমার অন্তঃকরণ যেন তোমার প্রদত্ত এই অনিত্য সম্পত্তি-দ্বারা গর্ব্বে পরিপূর্ণ না হইয়া তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

ভগবন্! তুমি আমাকে এমন শক্তি প্রদান কর, যাহার প্রভাবে আমি তোমার প্রদত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারি। অভাব-পীড়িত অর্থীর প্রার্থনা পূরণ,—বিপন্নের বিপদুদ্ধার,—ক্ষুধিতকে অন্নদান,—নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান,—প্রভৃতি তোমার অভাপ্সিত শুভ কার্য্য সকলের কোনটীই যেন আমা-কর্ত্তৃক অনাদৃত বা উপেক্ষিত না হয়।

দীননাথ! পার্থিব ধনসম্পত্তি সমস্তই ক্ষণস্থায়ী জানিয়া, উহার অভাব হইলেও যেন আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল না হয়। আমি অর্থাভাবে কষ্ট পাইয়া ধনলাভের নিমিত্ত যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা ও তোমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এখন এই

প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করিবার জন্যও যাহাতে আমি সেইরূপ চেষ্টা ও প্রার্থনা করিতে পারি, তুমি আমাকে এমন শক্তি প্রদান কর! এই অর্থ যে অনিত্য ও অশেষবিধ অনর্থের মূল, আমি যেন তাহা কোন কালেই ভুলিয়া না যাই।

হে অমূল্যধন! তুমিই সর্ব্বদা আমার হৃদয়-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া অবস্থান কর, আমি যেন সংসারে পরমানন্দ লাভ করিয়া অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সকল দুঃখই বিদূরিত করিতে পারি।

( প্রণাম। )

---

## যৌবনকালীন প্রার্থনা।

হে পরমপুরুষ! জননী-জঠর-শয্যায় অবস্থানাবধি তুমি আমাকে যে কত যত্ন ও স্নেহ সহকারে রক্ষা করিতেছ, ধীরভাবে তাহা চিন্তা করিলে আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিতে পারি না! সেই ভীষণ গর্ভ-বাস-সময়ে মাতৃগর্ভের সঙ্কীর্ণ স্থান-মধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তেই এমন কত শত ঘটনা ঘটিয়াছে, যদ্দ্বারা তোমার সম্যক্ অনুকম্পা-দৃষ্টির অভাবে আমি কোন্‌কালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম!

প্রাণেশ্বর! তুমি প্রতি নিমেষে আমার প্রতি যে অপরিসীম করুণা প্রদর্শন করিতেছ, আমি অনন্তকাল চেষ্টা করিলেও তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

জগদীশ! যখন আমি জননী-জঠর হইতে প্রসূত হইয়া তোমার সংসার দর্শন করিলাম, সেই অসহায় শৈশবাবস্থা হইতেই তোমার অপরিসীম স্নেহ ও করুণা ধারা অসংখ্য

ধারে নিপতিত হইয়া আমার দুর্ব্বল শরীর ও মনকে পরিপুষ্ট ও সবল করিতেছে। আহা! সেই শৈশব-সময় হইতে আমার আরামের নিমিত্ত যখন যাহা প্রয়োজন হইতেছে, তুমি সর্ব্বদাই তাহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতেছ; এবং হে দয়াময়! এই জীবন-ধারণ-কালে আমার যখন যে অভাব হইবে, তুমি তখনই তাহা দূর করিবে বলিয়াও সর্ব্বদাই আশ্বাস প্রদান করিয়া থাক।

আনন্দস্বরূপ! আমি তোমার প্রসাদে, মনের সুখে, তোমার এই সতত উন্মুক্ত পান্থনিবাসে অপর্য্যাপ্ত ভোগ্যবস্তু সম্ভোগ করিতে করিতে এখন যৌবনের প্রথম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু এই কমনীয় কালে আমার শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্টির সহিত অন্তঃকরণের সাধু বৃত্তি সকল যেমন বিকসিত হইতেছে, কাম ক্রোধাদি দুর্দ্দান্ত রিপুগণও সেইরূপ বলবান্ হইয়া হৃদয়-রাজ্যে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। বন্ধনমুক্ত অশ্ব যেমন কোন বাধা না মানিয়া আপনার অভিলষিত পথে ধাবমান হয়, আমার অনায়ত্ত রিপুগণও সেইরূপ তোমার প্রদর্শিত দুর্লঙ্ঘ্য সদাচার-সীমা অতিক্রম করিয়া আরাম-হীন প্রদেশে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে। প্রাণবন্ধো! আমি এ সময় তোমার শক্তি না পাইলে কিরূপে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়া, নিত্যানন্দ-নিলয়ে উপস্থিত হইতে পারিব! হে অভয়দাতঃ! আমি এই সঙ্কট-সময়ে যে কিরূপে নিরন্তর তোমার প্রসাদ লাভ করিতে পারিব, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি।

ভগবন্! তুমি যে দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, তাহা আমি জানি; কিন্তু তোমার অনুকম্পায়, তোমারই প্রদত্ত সুক-

তির সাহায্য ভিন্ন, শত্রুগণের সহিত ভীষণ সংগ্রামে কে জয় লাভ করিতে পারে? তোমার অনুকম্পা ব্যতীত আমি রিপুগণের দুর্নিবার প্রলোভন ও সংসারাসক্তির বিষম আকর্ষণ হইতে এই যৌবন-বান্ধবকে কিরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব!

হে আর্ত্তবন্ধো! তুমি এই ভীষণ শত্রু-সংগ্রামে আমাকে রক্ষা না করিলে আমি যে আর কোন ক্রমেই দুর্জ্জয় রিপুগণকে আয়ত্ত রাখিতে পারিব না! তোমার অমোঘ-শক্তি প্রাপ্ত না হইলে আমার জীবন-পাদপের এই সদ্গন্ধময়, সুন্দর যৌবন-কুসুম তোমার চরণে অর্পিত (শুভ কার্য্যে যাপিত) না হইয়া, কালক্রমে রিপু-বিষধর-সহবাসে যে নিশ্চয়ই বিষময় ফলে পরিণত হইবে, তাহা ত তুমি জান! অতএব হে নাথ! তুমি পথ দেখাইয়া আমাকে এই বিপৎসঙ্কুল ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে উদ্ধার কর, নতুবা আমার আর উপায়ান্তর নাই।

প্রাণেশ্বর! তুমি ভিন্ন আমি আর কাহার শরণাপন্ন হইব! এই বিপন্নাবস্থায় তোমার নিরাপদ্ পদাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া আর কোথায় গিয়া শান্তি পাইব—নাথ! আমার অন্তর-সাগরে 'কুচিন্তার' প্রবল তরঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে,—রিপুগণ বন্ধন-বিমুক্ত অশ্বের ন্যায় প্রতিক্ষণেই 'অশান্তির' * অভিমুখে ধাবিত হইতেছে,—হৃদয়ের শুভ-বৃত্তি সকলের গতি প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে,—অন্তর-রাজ্যে নিরন্তরই দেব-দানবের সংগ্রাম চলিতেছে;—এই ভয়ানক সময়ে আমি যে আর

* অশান্তির উৎপত্তি, স্থিতি, কার্য্য ও বিনাশ-ব্যাপার জীবন-পরীক্ষায় সামর্থ্যানুসারে বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

কাহাকেও আমার রক্ষক দেখিতে পাইতেছি না! দয়াময়! এ সময় তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা কর!

হে পরমদেব! তুমি আমার হৃদয়-সিংহাসনে সমাসীন হইয়া, মনের শুভবৃত্তি সকলকে শক্তি প্রদান কর! তোমার প্রসাদরূপ মলয়ানিল-সঞ্চালন দ্বারা আমার অন্তর-প্রদেশের কুচিন্তা-কুজ্ঝটিকা অপসারিত কর! আমার অনায়ত্ত রিপুগণকে তোমার দিকে আকর্ষণ কর! আমি যেন সংসার-সাগরের ভীষণতম তরঙ্গ মধ্যেও তোমার আনন্দময়ী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া, সাগরমধ্যস্থ ভূধরের ন্যায় অটলভাবে অবস্থান করিতে পারি। শত্রুগণ আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া যেন আর কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে না পারে।

হে সত্যস্বরূপ! তোমার পদতলে আমার জীবন, যৌবন, মন, প্রাণ, সমস্তই অর্পণ করিলাম, আমাকে রক্ষা কর।

( প্রণাম। )

## বৃদ্ধকালীন প্রার্থনা।

হে সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ! আমি তোমার অনুকম্পায় উৎকৃষ্ট মানব-শরীর প্রাপ্ত হইয়া, সংসার-রাজ্যে বাল্য-যৌবনাদি অবস্থা অতিক্রম করিয়া, এখন এই বার্দ্ধক্য-দশায় উপনীত হইয়াছি। এ সময় বাল্যের সেই কমনীয় সানন্দ ভাব, যৌবনের সেই অতুলনীয় প্রফুল্লতা, প্রৌঢ়াবস্থার সেই সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য, সমস্তই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে কোথায় পলাইয়াছে,

এখন তাহার আর কোন সন্ধানই পাইতেছি না। যে শক্তি-দ্বারা আমি এতকাল গর্ব্বিত ছিলাম, সেই শক্তিও আমাকে ত্যাগ করিয়া যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, এখন কেহই আর তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারে না।

আমার সেই চক্ষুই এখন আর আমাকে সংসারের কোন পদার্থ দেখাইতে পারে না,—সেই কর্ণই এখন আর আমাকে কোন শব্দ শুনাইতে পারে না,—সেই পদদ্বয়ই এখন আর আমার শরীর বহন করিতে পারে না,—এবং যে সুদর্শন দশন সকল আমাকে কত প্রকার বস্তুর ভোজন-বিষয়ে সাহায্য করিত, এখন তাহারাও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এখন আমি যে কি অবস্থায় আছি, হে অন্তর্যামিন্! তাহা তোমাকে বলিয়া আর কি জানাইব!

এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়াই এখন মনে হইতেছে যে, বুঝি আমাকে এত যত্নের এই শরীর ছাড়িয়া মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। কিন্তু হে অন্তিমশরণ! এই আসন্নমৃত্যুকালে আমার যে কি অবস্থা ঘটিবে, এখন তাহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি নিতান্তই ব্যাকুল হইয়াছি।

প্রভো! কিরূপে আমি কৃতান্তকে আত্মসমর্পণ করিব! কেমন করিয়া এত সাধের এই সংসার ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া যাইব! এই সকল ভাবিয়া আমি আতঙ্কে কম্পিত হইতেছি; সর্ব্বদাই যেন 'মৃত্যু' নামক কি এক ভীষণ মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া আমাকে বিভীষিকা দেখাইতেছে। উঃ! আমারই জন্য যেন সে, কি এক প্রকার অসহ্য-যাতনাময় স্থানের সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বদাই আমাকে তাহার প্রতিরূপ

দেখাইতেছে। আহার বিহার, সুখ সম্পদ্, বাস বিত্ত, কিছুতেই যে আর আমার প্রাণ আরাম পাইতেছে না।

হে ভবতারণ! সংসারে আসিয়া অবধি আমি যে কত অপকর্ম্ম করিয়াছি, তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। এখন সেই সকল দুরাচার যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া দণ্ডধারণপূর্ব্বক অবিরাম আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এবং সেইজন্যই হে অভয়নিদান! আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া তোমারই শান্তি-ময় চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। পিতৃদেব! আমি তোমার সন্তান, অপরাধ করিয়াছি বলিয়া এই অসময়ে আর কোথায় যাইব! কে আর এই বিপদ্ হইতে আমাকে রক্ষা করিবে! কে আর আমার ব্যথিত প্রাণকে শান্ত করিবে! হে মঙ্গলময়! আমি মায়া-বশে তোমাকে ভুলিয়াছি বলিয়া তুমি যদি আমায় শ্রীচরণে আশ্রয় না দাও, তবে আর আমার কে আছে—কৃপাসিন্ধো! এই সংসারের যে দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, সকল স্থানই যেন অন্ধকারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। অকর্ম্মণ্য হইয়াছি বলিয়া এখন স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, সকলেই যেন আমাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হয়, ইঙ্গিতে নিরন্তরই এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। অতএব হে অন্তিমসহায়! এ সময় আমি তোমা-ব্যতীত আর কাহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিব—নাথ! তুমি যদি পাপী বলিয়া আমাকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে—দীনবন্ধো! আমার অপরাধের জন্য যদি তুমি আমাকে অসংখ্যপ্রকার দণ্ডবিধান কর,—অধম বলিয়া যদি আমাকে নিকটস্থ রাখিতেও ইচ্ছা না কর,—তথাপি হে অনাথশরণ! আমি কখনই তোমার আশ্রয়

পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি যখন তোমারই সন্তান, তখন যতই অপকর্ম্ম করি না কেন, কাতর হইয়া রোদন করিলে তুমি আমাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না,—ইহাই আমার একমাত্র ভরসা।

এখন আমি সংসারের আর কাহাকেও চাহি না। তুমি ভিন্ন আর কেহই যে আমার 'আপনার' নহে, আমি এখন তাহা একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি; এবং হে অনাথশরণ! সেইজন্য এখন তোমারই শরণাপন্ন হইয়াছি। পিতৃদেব! এই সময় তুমি আমাকে শান্তির আশা প্রদান কর,—আমার ভব-সন্তপ্ত প্রাণে তোমার প্রেমামৃত সিঞ্চন কর,—যদ্দ্বারা আমার এই ভগ্ন-দেহ-বাস-কালের অবশিষ্ট কয়েক দিবসের জন্য দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া তোমারই প্রেমানন্দশান্তিময়ী নিত্যপ্রতিমা সন্দর্শন করিতে পারি; এবং হে ভবকারণ! এই মৃত্যুর পর আর যেন কোন কালে তোমা হইতে আমার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি না হয়,—মৃত্যু-কালে তোমার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, তোমার কৃপায় তোমাতেই আশ্রয় লাভ করিতে পারি।

(প্রণাম।)

---

## মৃত্যুকালীন প্রার্থনা।

হে অন্তর্যামিন্! আমি এই সংসার লীলা-ভূমিতে হাসিয়া কাঁদিয়া এখন জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে, তোমার শ্রীপাদপদ্মে নিত্য-নিবাস-লাভের আশায় এই মৃত্যু-শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। এই জীবন-ধারণ-কালে আমি কত চেষ্টা, ও কত

কুকর্ম্ম, করিয়া যে প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলাম, এখন আমাকে সে সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। আহা! যে স্ত্রী, পুত্রাদি পরিজনবর্গকে আপনার বোধে ক্ষণকালও নয়নের অন্তরাল করিতে ক্লেশ পাইতাম, এখন তাহারাই আমাকে বিদায় দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে; এবং সমগ্র সংসারই যেন ভীষণ কৃতান্তরূপে আমার সম্মুখীন হইয়া এই শান্তিহীন শরীর নিবাস হইতে আমাকে কোথায় লইয়া যাইবার জন্য ভয় প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু হে অন্তিমশরণ! আমি যে কোথায় যাইব, তাহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে বড়ই আকুল হইয়াছি, এখন তুমি প্রসন্ন হইয়া, সম্মুখে আসিয়া, অভয় দান না করিলে আমার যে আর কোন উপায় নাই।

হরি! বিপন্ন জনের উদ্ধারকর্ত্তা তুমি,—কাতর জনের ত্রাণকর্ত্তা তুমি,—পাপিজনের শাস্তিবিধাতা তুমি;—অতএব হে শান্তিময়! এই অন্তিমসময়ে তুমি আমার সম্মুখে ভুবনমোহন রূপে প্রকাশিত হও, আমি ভীষণমূর্ত্তি কৃতান্তের দশন-ভয় ভুলিয়া তোমার প্রসন্ন বদন দেখিতে দেখিতে এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করি।

পরমেশ! বাল্যকালে মাতা-পিতারূপে তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ,—যৌবনকালে প্রিয়-পত্নীরূপে তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ,—প্রৌঢ়কালে পুত্র-কন্যারূপে তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ,—এবং বৃদ্ধকালেও দাসদাসীরূপে তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ; হে প্রেমময়! জীবনকালে আমি এক দিনও তোমার প্রেমের অভাব দেখিতে পাই নাই। তথাপি আমি আত্মবিস্মৃতিবশে তোমাকে ভুলিয়া ছিলাম। তজ্জন্য অনুতাপ আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। দীননাথ! আর আমি

তোমায় কখন ভুলিব না,—আর আমি রিপুর বশীভূত হইব না,—আর আমি অশান্তির সেবা করিব না;—এখন তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হইয়া আমার মোহান্ধকার ধ্বংস কর! আমি তোমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তোমার আরামময় অঙ্কে নিত্যাশ্রয় লাভ করি।

( প্রণাম। )

---

## দশম আহ্নিক।

### কর্ত্তব্য-স্থিরীকরণ।

মানব-শরীরধারী প্রাণিগণের মধ্যে যদি কেহ সুখ ও দুঃখের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত-সুখের আকাঙ্ক্ষী হন, তবে তাঁহাকে উহা প্রাপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি কার্য্যের-অনুষ্ঠানে বাধ্য হইতে হয়। সেই কার্য্যগুলিই তাঁহার 'কর্ত্তব্য'। কিন্তু তাঁহার 'কর্ত্তব্য' যে সুখাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই 'কর্ত্তব্য' বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যক্তি 'কর্ত্তব্য'-বোধে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান-দ্বারা সুখ-লাভ করিয়াছেন, সুখাকাঙ্ক্ষী সকল ব্যক্তিই যে সেই সকল কার্য্যকে আপনাদের 'কর্ত্তব্য' বোধ করিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

অদ্যাপি মানব-সমাজে প্রায় কোন কর্ত্তব্যই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। তজ্জন্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মত, ধর্ম,

কোরান, বাইবল্ প্রভৃতি নানাবিধ 'শাস্ত্র'-নামে প্রকাশিত হইয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট 'কর্ত্তব্য'রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে *।

এইরূপ বিভিন্নপ্রকারে স্থিরীকৃত কর্ত্তব্য, যে যে দলের মনোনীত হইল, তাঁহারাই হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ ঐ সকল কর্ত্তব্য বা মতই ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে সাধারণ-কর্ত্তৃক সমাদৃত ও আচরিত হইতে লাগিল।

এইভাবে কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইবার পর, মানব-শরীর-ধারী প্রাণিগণ আপন আপন কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বা ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু কালসহকারে বংশপরম্পরাক্রমে আন্তরিক অবস্থার পরিবর্ত্তনানুসারে অনেকে আপনাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক 'কর্ত্তব্য' বা 'ধর্ম্মের' প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিলেন। অর্থাৎ অনেকেই আপনাদের সাম্প্রদায়িক কর্ত্তব্য মনোমত না হওয়ায়, উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন †।

---

* সাধারণের পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত করিয়া অভিনব মত সংস্থাপন করিতে হইলে, জীবনে যে কত বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহা চৈতন্য, নানক, মহম্মদ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাজনগণের জীবনী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

† ইহা যে কেবল আজ কাল হইতেছে এমন নহে। বৈষ্ণব-গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কালে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হরিদাস (যবন হরিদাস) নামক একজন ভক্ত মহাত্মা, আপনার সাম্প্রদায়িক-'কর্ত্তব্য' বা 'ধর্ম্ম' নিজের অতৃপ্তিকর হওয়ায়, হিন্দুর 'কর্ত্তব্য' বা 'ধর্ম্ম' আদরের সহিত গ্রহণ, এবং মুসলমান রাজার দুর্ব্বিষহ উৎপীড়ন পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াও প্রাণপণে তাহা পালন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা

এইরূপে এক সময় যেমন এক সম্প্রদায়, অন্য সকল সম্প্রদায়কে নির্জ্জীবপ্রায় করিয়া নানা দেশে আপনাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে লাগিল, তেমনি কিছুকাল পরেই আবার ঐ হীনবল সম্প্রদায় সকলের মধ্যে একটী সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠিল; অথবা আর একটী সর্ব্বসারগ্রাহী অভিনব সম্প্রদায় সঙ্ঘটিত হইয়া অনেকেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল।

কর্ত্তব্যের এই প্রকার অনিশ্চয়তাসত্ত্বেও এমন কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা প্রায় কোনকালেই কোন সম্প্রদায়ের নিকট অকর্ত্তব্য বলিয়া পরিত্যাজ্য হয় নাই, এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। যথা,—কোন ব্যক্তিকে যদি জলমগ্ন হইতে দেখা যায়, তবে তাহাকে উদ্ধার করা, সকল সম্প্রদায়েরই অনুমোদিত কর্ত্তব্য। যদি ক্ষমতা থাকে, তবে ক্ষুধিত ব্যক্তিকে অন্ন দান করা, সর্ব্ববাদিসম্মত কর্ত্তব্য। সকলের দুঃখকেই নিজের দুঃখের সমান বোধ করিয়া তাহা দূরীকরণার্থ চেষ্টা করা, সকলেরই অনুমোদিত কর্ত্তব্য; ইত্যাদি।

যাহা হউক, ঐপ্রকার সর্ব্বসম্প্রদায়ের অনুমোদিত কর্ত্তব্য সকলের মধ্যে, যাহার অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে আমাদের ন্যায় আত্মবিস্মৃত ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণ আরাম বা সুখ প্রাপ্তির অভাবে ক্রমশঃ পশুভাবে পূর্ণ হয়, মহাজনগণের উপদেশানুসারে সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

---

স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মানব-সমাজের 'সর্ব্ববাদিসম্মত কর্ত্তব্য' স্থির করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে।

## মুখ্য-কর্ত্তব্য-নির্ণয়।

সংসারাশ্রমে বাস করিতে হইলে প্রথমতঃ আপনার অভাব-দূরীকরণার্থ চেষ্টা সকলেরই কর্ত্তব্য। কারণ, অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তি প্রায় সর্ব্বদাই অসুখী। কিন্তু বিলাসিতাবর্দ্ধক অভাবের প্রশ্রয় না দেওয়াও অবশ্য কর্ত্তব্য।

আপনার অভাব দূরীভূত হইলে পর, যদি ঐ অভাব-নাশক পদার্থ (অর্থাদি) উদ্বৃত্ত হয়, তবে তদ্দ্বারা প্রতিবেশবাসী, গ্রাম-বাসী, নগরবাসী ও রাজ্যবাসী প্রভৃতি-ক্রমে যে কোন ব্যক্তির অভাব জানিতে পারা যায়, সাধ্যমত তাহারই সেই অভাব দূর করা কর্ত্তব্য। আর যদি ঐরূপ অর্থাদি না থাকে, তবে যথাসাধ্য শারীরিক পরিশ্রমাদি-দ্বারাও আর্ত্তের উপকার করা কর্ত্তব্য। পরোপকারে * চিত্ত প্রশস্ত হয়, এবং অনুপম আনন্দ জন্মে।

অতিথিকে দেব-বোধে নিজের ক্লেশার্জ্জিত অন্নের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত দিয়াও তাঁহার সেবা করা গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

অভাব-হীন ব্যক্তির পক্ষে ভিক্ষুকদিগকে প্রত্যাখ্যান বা বিমুখ না করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর অসামর্থ্যবশতঃ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইলেও, এরূপ বিনীতভাবে উহা করা উচিত, যেন কর্ত্তার আচরণে তাঁহারা কোনরূপে মর্ম্মাহত না হন।

---

* যতক্ষণ আত্ম-পর-পার্থক্য-বোধ থাকে, ততক্ষণ পরোপকার-দ্বারা আনন্দ লাভ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (জ্ঞান দৃষ্টিতে) সংসারে আত্ম-পর-প্রভেদ নাই। যতক্ষণ আমরা 'পর' দেখিতে পাই, ততক্ষণ 'আপনাকে' দেখা যায় না; আবার যখন 'আপনাকে' দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আর 'পর'-বোধ থাকে না। আর যখন আপন ও পর, এই উভয়ের কিছুরই বোধ থাকে না, তখনই আমাদের মনুষ্যত্ব, দিব্য-জ্ঞান, বা নিত্যানন্দ, লাভ হয়।

## সত্যকে সর্ব্বদা হৃদয়ের সহিত আদর করা কর্ত্তব্য।

মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সকলে এক পরিবারমধ্যে ঐক্যভাবে বাস করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ পরিজনবর্গের মধ্যে যেন পরস্পর মানসিক অনৈক্য, বা মনান্তর কোনকালেই সঙ্ঘটিত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান্ থাকা কর্ত্তব্য। আর সর্ব্বদাই এরূপ ভাবে চলা উচিত যেন নিজ-স্বচ্ছন্দতার সহিত অপরের স্বচ্ছন্দতার বিরোধ কখনও না ঘটে। এই ঐক্যভাব পুত্র কন্যা প্রভৃতিকেও যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; তাহা হইলে কালক্রমে তাহারাও নির্ব্বিরোধ-জনিত দুর্লভ সুখের অধিকারী হইতে পারিবে।

সংসর্গের প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কোন বন্ধুরূপী কপট শত্রুর সংসর্গে নিস্মল স্বভাব যেন কখনই কলঙ্কিত না হয়, এজন্য বিশেষ সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। অসৎ-সংসর্গের সহিত যদি মাদকদ্রব্য মিলিত হয়, তবে মানব-শরীর ধারী প্রাণী অল্পকালমধ্যেই পশুভাব ধারণ করে। অতএব মাদকদ্রব্য-ব্যবহার হইতেও সর্ব্বদা সতর্ক থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে নিরন্তর আয়ত্ত রাখিতে সবিশেষ যত্নবান্ থাকা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে উহারা প্রভুর (মনের) সর্ব্বনাশের সঙ্কল্পে তাঁহারই উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে; এবং প্রভুও ক্রমশঃ ঐ দাসগণের দাসত্ব করিতে বাধ্য হইবেন। উহাদের কর্ত্তৃত্ব-সম্ভূত বিষম অত্যাচারে যদি কোন কালে প্রভু মনের চৈতন্যোদয় হয়, তবে অনুতাপের আর সীমা থাকিবে না। অতএব যেন দাসের দাসত্ব করিতে না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই সবিশেষ সতর্ক থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সকল কার্য্যের মধ্যেই ধীরে ধীরে বন্ধুর অনুসন্ধানও আমাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। ভূমিষ্ঠ হইবার পর, পদার্থ-জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, আমাদের বান্ধব-লাভ-বাসনা বলবতী হয়; এবং বন্ধুহীন হইয়া সংসারে থাকিতেও পারা যায় না। কিন্তু বন্ধু চিনিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। যিনি বিপদে রক্ষা করেন, প্রশংসা গোপন করেন, অপরাধ-প্রদর্শন ও তাহার সংশোধনে প্রাণান্ত যত্ন করেন,—স্বার্থ-সাধন-কামনা যাঁহার ইঙ্গিতেও কখন উপলব্ধি না হয়, জগতে তিনিই আমাদের 'বন্ধু'। আর যিনি বিপদ্ সম্পদ্, ক্ষুধা তৃষ্ণা, জরাদি হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্ব্বকালেই আমাদিগকে সমভাবে ভালবাসেন, রক্ষা করেন, এবং আশ্রয় দেন, তিনিই আমাদের পরমবন্ধু পরাৎপর পরমেশ্বর। অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত সাংসারিক বন্ধুর সহায়তায় সাংসারিক সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে, মনে মনে, করুণানিধান পরমবান্ধব ভগবান্‌কে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে বা ভক্তি করিতে সমর্থ হওয়াই, আমাদের 'পরম কর্ত্তব্য।'

আমরা সংসারে থাকিয়া যাহা করিব তাহা সেই পরমবন্ধুর কার্য্য,—যাহা বলিব তাহা সেই পরমবন্ধুর কথা,—যাহা দেখিব তাহা সেই পরমবন্ধুর পদার্থ,—যাহা শুনিব তাহা সেই পরমবন্ধুর স্বর,—ইত্যাদি আমাদের ইন্দ্রিয়সাধ্য যে কোন ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবে, সে সমস্তই—"সেই পরমবান্ধব পরাৎপর পরমেশ্বরের",—এই বিশ্বাস সুদৃঢ় করিতে পারিলেই আমাদের কর্ত্তব্য-পালন, ধর্ম্ম-সাধন, পরমাত্মায় আত্ম-সমর্পণ, আনন্দ-লাভ প্রভৃতি যাহা কিছু কর্ত্তব্য ও অভীষ্ট আছে, সে সমস্ত নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে, সংশয় নাই।

আহা! কবে যে—আমরা সেই শুভদিন লাভ করিব,—কবে যে আমরা 'আপনার' প্রতি অনুরক্ত হইব,—কবে যে আমরা গুরুজনের হিতোপদেশ মানিব,—কবে যে আমরা দাস গণের দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইব,—দীনবন্ধো! অন্তর্যামিন্! তুমিই তাহা বলিতে পার! আমাদের রক্ষক, পালক, শাসক, শাস্তিবিধায়ক, সমস্তই তুমি; কিন্তু কে তুমি, মোহান্ধ আমরা—আত্মহারা আমরা—কিরূপে তাহার তত্ত্ব-নিরূপণ করিব নাথ! দয়াময়! তুমি আপনিই কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হও এবং আমাদিগকে কর্তব্য-পথ প্রদর্শন কর! আমরা তোমার অনুগত থাকিয়া, তোমারই প্রদর্শিত পথে চলিয়া, তোমার সংসারেই আনন্দ-লাভ করি; এবং অবশেষে শরীর-নিবাস ছাড়িয়া তোমারই পদাশ্রয় প্রাপ্ত হই।

( প্রণাম। )

---

## রাগিণী মূলতান,—তাল একতালা।

( বাউলের সুর। )

হরি! কেমন ক'রে করি তোমার তত্ত্ব নিরূপণ।
তুমি অনাদি, অনন্ত, অন্ত না জানি কেমন!
স্থলে, জলে, অনলে, ফুলে,
মায়ায়, জ্ঞানে, পুণ্যে, পাপে, আছ সকলে;
আমি যে ভাবে যেখানে খুঁজি হে,
( তোমার ) তা'তেই করি দরশন ॥

তুমি আপনি মর, আপনি হও প্রকাশ,
আপনার শোকে আপনি কাঁদ, আপনি হও উদাস,
( আবার ) আপনার ভাবে আপনি হাস হে,
( হও ) আপনার মোহে অচেতন ॥
(ভবে) আপনি খেল, আপনি নাচ গাও,
আপনি ব'স আসর-জুড়ে, আপনারেই মাতাও;
( তোমার ) আপনার দেশে আপনি রাজা হে,
( আবার ) আপনিই প্রজা হও কখন ॥
তোমার স্বরূপ কে বল জানে,
শুনি যোগিজনে নয়ন মুদে নাহি পান ধ্যানে,
( কিন্তু ) ভক্তজনে ভক্তি গুণে হে,
( তোমায় ) দেখেন হৃদে অনুক্ষণ ॥
যে তুমি হও 'দয়াল' এই জানি,
আমায় ছেড়ে থাক্‌বে কোথা' ধ'রব তখনি,
তুমি আমার আমি তোমার হে,
(ভাবে) ভিন্ন নহে কদাচন ॥

দয়াময়! আমি তোমার সেবক এবং তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্যদেব; প্রভো! আমার সকল অভিমান যেন তোমাকে পাইয়াই চিরদিনের মত নিবৃত্ত হয়, তুমি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর! আমি তোমার চরণে প্রণত রহিলাম।

নমো ভগবতে বিশ্বরূপায়।

---

যথাশক্তি সমাপ্ত।

# প্রিয়নাথ-প্রণীত পুস্তক-সমূহের
# সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

প্রথম পুস্তক

## মদ খাও—নেশা ছুটিবে না।

(আশ্চর্য্য সত্য স্বপ্ন।)

দ্বিতীয় সংস্করণ ; মূল্য ছয় আনা।

যিনি সংস্কার-বন্ধনের বিষম যাতনাসমূহ ভুলিয়া 'অবিচ্ছিন্ন-সুখ' বা 'নির্ম্মলানন্দ' লাভ করিতে চাহেন, তাঁহার পান-যোগ্য হইবে বলিয়া এই পুস্তকে একপ্রকার 'নূতন মদের' বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এ মদ পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না, এ মদ মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, সকলে মিলিয়া সর্ব্ব সময়ে, স্বচ্ছন্দে ও নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে সেবন করা যায়; এবং এ মদের সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত শক্তি এই যে, একবার কোনক্রমে সেবন করিলে চিরকাল ইহার পূর্ণ নেশা থাকে। এ মদ কোথায় পাওয়া যায়, কিরূপে খাইতে হয়, ইত্যাদি অনেক কথাই এই পুস্তকে লেখা আছে।

এই অদ্ভুত-শক্তি-সম্পন্ন মদের সংবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবার পর ধীর-জন-সমাজে ইহার দোষ-গুণ সমালোচনার জন্য প্রদত্ত হওয়ায়, দেশস্থ সাধারণ-মাননীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ, এবং সুপরিচিত-সংবাদ-পত্র-সমূহের মধ্যে অধিকাংশই, এতৎসম্বন্ধে যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, স্থানাভাবে এস্থলে তাহা প্রকাশের সুযোগ হইল না।

---

দ্বিতীয় পুস্তক

## আনন্দ-তুফান।

( শরৎকালে ভক্তের সাত্ত্বিক দুর্গোৎসব। )

দ্বিতীয় সংস্করণ ; মূল্য চারি আনা।

যে হিন্দুসন্তান বর্ষাপগমে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর-মূর্ত্তি-দর্শনে, মা দুর্গতি-নাশিনী আনন্দময়ীর শরৎকালীন আবাহন-কাল সম্মুখীন বুঝিয়া, সহর্ষ-মনে ( নিজপ্রকৃতির অনুমোদিত হর্ষ-সহকারে ) তৎকালোচিত আয়োজনে ব্যাপৃত

হন, "আমার ভবনে মা আনন্দময়ী আসিবেন" বলিয়া, যে আবাস-স্বামী (নগর গ্রাম ও ধনী দরিদ্র ভেদে) কত প্রকারেরই আয়োজনে অর্থ ব্যয় করেন, এবং যথাকালে নয়নরঞ্জিনী প্রতিমারূপিণী আনন্দময়ীকে (নিজ-হৃদয়ে মা'কে সপ্রকাশ বুঝিবার উপযুক্ত ধ্যানে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে) মৌখিক মন্ত্র-দ্বারা আবাহন, লৌকিক উপচার-দ্বারা পূজা, মহিষ ছাগাদিকে বলিদান (ছেদন) ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপার-দ্বারা কেবল নিয়ম-রক্ষা বা কর্ত্তব্য-পালন করেন, এই পুস্তকে তাঁহাদের শিক্ষা-প্রদান-সঙ্কল্পে, ভক্তের নিত্যানন্দোদ্দীপক প্রথায়, বিশ্বরূপিণী পরমেশ্বরীকে অন্তর-চণ্ডীমণ্ডপে বসাইয়া পূজা করিবার নিমিত্ত, 'দুর্গা'নামে তাঁহার 'আবাহন,'—ভক্তি-চন্দন-সিক্ত-মানস-পুষ্প দ্বারা 'পূজা',—রিপুগণকে পাপরূপ রক্তবস্ত্র পরাইয়া 'বলিদান',—জ্ঞানের হস্তে পঞ্চভূতরূপ পঞ্চপ্রদীপ প্রদান-দ্বারা 'আরতি',—ভব-বন্ধন-পরিত্রাণ-প্রার্থনায় প্রেমপূর্ণ স্তোত্র পাঠ-দ্বারা 'প্রণাম', এবং ঐরূপ প্রথায় 'বরণ', 'বিসর্জ্জন', 'সিদ্ধিপান' ও 'শান্তি' প্রভৃতি অভিনব আধ্যাত্মিক-প্রক্রিয়া বর্ণন-দ্বারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রিয়নাথ নিজ-ভাবুক-হৃদয়োৎপন্না চমৎকারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই পুস্তকেরও কতকগুলি সমালোচন-লিপি সংগৃহীত আছে; কিন্তু এস্থলে তাহা প্রকাশের স্থানাভাব।

---

## তৃতীয় পুস্তক

# জীবন-পরীক্ষা

## বা

## ভীষণ স্বপ্ন-চতুষ্টয়।

### দ্বিতীয় সংস্করণ; মূল্য দুই টাকা।

মানব যে বিষয়কে বহিরিন্দ্রিয়-দ্বারা পরীক্ষা করিতে অশক্ত হয়, তাহাকেই অলীক, মায়া বা 'স্বপ্ন' বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সংসারাসক্ত আত্মবিস্মৃত মানব, বহিরিন্দ্রিয়-দ্বারা জীবন, বা জীবনস্বরূপ জগদীশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া, তাহাদের আত্মজ্ঞান-লাভের সহায়মাত্র হইবার জন্য, এই 'জীবন-পরীক্ষা' চারিটী স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম স্বপ্ন—নির্ব্বেদ, অর্থাৎ নশ্বরজ্ঞানবশতঃ সংসারে ঔদাসীন্য। দ্বিতীয় স্বপ্ন—সংগ্রাম, অর্থাৎ সংসারে বর্ত্তমান-শরীর-লাভানন্তর 'সুমতির সহায়তায়, 'মায়া', 'পাপ', 'কুচিন্তা' এবং উহাদের প্রিয় সহচর "কাম', 'ক্রোধ

প্রভৃতি রিপুগণের সহিত সংগ্রাম। তৃতীয় স্বপ্ন—প্রার্থনা, অর্থাৎ নিজকৃত কু-কর্ম্মের নিমিত্ত অনুতপ্ত বা আত্মগ্লানি-পীড়িত হইয়া প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা বা আত্মানুসন্ধান-শক্তি প্রার্থনা। চতুর্থ স্বপ্ন—শান্তি, অর্থাৎ অনুতপ্ত প্রাণিগণের সকরুণ প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, 'কৃতান্ত' নামক অন্তিম-বন্ধুর সহায়তায় তাঁহাতে তাহাদের আত্মসমর্পণ বা লীন হওন।—সংক্ষেপতঃ বলিতে হইলে, এই গ্রন্থে সংসার, জীবন, জীব, জীবের অবস্থা ও কর্ত্তব্য, হৃদয়, প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির বিকৃতি বা রিপু, আমাদের প্রতি রিপুর আচরণ, পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম, মায়া, জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, মৃত্যু, সূক্ষ্ম-শরীর, যমালয়, যমালয়স্থ জীবের অবস্থা, নরক, স্বর্গ, সৃষ্টি, স্থিতি, অনন্তশক্তি, একশক্তি, শক্তিলয় বা শান্তি প্রভৃতি বিষয় সকল আনন্দজনক গল্প-চ্ছলে ও সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের চিত্ত যে সকল পদার্থ পাইলে সন্তুষ্ট হয়, সে সকল ইহাতে নাই। জীবন-পরীক্ষায় যাহা আছে, তাহা কেবল অন্তর্জ্জগৎ-সম্বন্ধীয় ব্যাপার। সেখানে সত্য বিবেকাদির অধিকার,—সুমতি দয়া ও শান্তির নিত্য-নিলয়। সেখানে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহার কোন কালে ধ্বংস বা বিকৃতি নাই,—সেখানে জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, তাপ আদি নাই; কিন্তু মোহান্ধতা ও আত্মবিস্মৃতিবশতঃ আমরা কিরূপে সেই নিত্য-নিলয়ের আনন্দ অনুভব করিতে পারিব!—কুসংসর্গ যাহাদের আনন্দ-প্রদায়ক,—কুরুচিপূর্ণ পুস্তক যাহাদের সহচর,—ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা যাহাদের ধর্ম্ম,—প্রতারণা যাহাদের ব্যবসায়,—জীবন-পরীক্ষায় বিবৃত 'কে আমরা?' 'কেন এখানে আসিয়াছি?' এবং 'কি করিতেছি?'—ইত্যাদি প্রশান্ত-চিন্তা-জনক বিষয়সমূহ তাহারা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে!

গ্রন্থের বিষয়ে আমাদের অধিক কিছু বলা ভাল দেখায় না। তবে এই-মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে সকল বঙ্গদেশীয় সন্তান মাতৃভাষাকে আদর করেন,—ভাবময়ী কবিতাকে আদর করেন,—সুললিত ভগবৎ-সঙ্গীতকে আদর করেন,—যাঁহারা সমাজ-ঘটিত জাতিভেদ, লোকাচার ও কুসংস্কারাদির আদি কারণ জানিতে ইচ্ছা করেন,—অথবা এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের অভিনব আভ্যন্তরীণ-রহস্য যথাসম্ভব জানিতে অভিলাষ করেন,—তাঁহারা দ্বিতীয়বার-প্রচারিত, ভগবদ্ভক্ত-জন-সমাদৃত (৩৭৬ পৃষ্ঠ-পরিমিত) এই পুস্তকখানি একবার দেখিবেন কি? এই গ্রন্থে 'ভব-কারাগার', 'স্বর্গরাজ্য', 'কৃতান্তপুর' ও 'মহাপ্রলয়' নামক চারিখানি অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্র এবং প্রিয়নাথের একখানি প্রতিমূর্ত্তিও প্রদত্ত হইয়াছে।

'জীবন-পরীক্ষা' জনসমাজে পূর্ণাকারে প্রচারের পূর্ব্বে ও পরে, কলিকাতা, ভাটপাড়া, নবদ্বীপ ও কাশীধাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের বহুজন-পরিচিত

বিভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত মহাত্মগণ, এবং বহু সংবাদপত্র-সম্পাদকও, এই পুস্তক-সম্বন্ধে একবাক্যে যে সমস্ত উদার অভিপ্রায়-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহা প্রকাশের স্থানাভাব।

---

চতুর্থ পুস্তক

## আহ্নিক-ক্রিয়া

বা

### সংসারবাসী আত্মবিস্মৃত জীবের দৈনিক ও সাময়িক কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ ; মূল্য চারি আনা।

---

পঞ্চম পুস্তক

## কুমার-রঞ্জন।

### ( সৎ-কবিতামালা। )

প্রথম ভাগ ; মূল্য পাঁচ আনা।

বিদ্যালয়ে সুকুমারমতি শিশুগণের নীতি-শিক্ষোপযোগী কবিতা-পুস্তকের অসদ্ভাব না থাকিলেও, কিঞ্চিদধিকবয়স্ক বালকবৃন্দের প্রীতিজনক গল্পাদি স্থলে কর্ত্তব্য-শিক্ষা, চিত্তোৎকর্ষ-সাধন, কবিতামৃত-রসাস্বাদন এবং তৎসঙ্গে (উহাদিগের পক্ষে যতদূর সম্ভব) ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ প্রভৃতির উপযোগী পুস্তকের অসদ্ভাব আছে বলিয়া কলিকাতা-নগরীস্থ রাজকীয় বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য কোন কোন অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিভাগ-সংসৃষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে এই কুমার-রঞ্জন-পুস্তক মুদ্রিত হয়। মুদ্রণের পর, উহা সাধারণে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে, আশানুরূপ হইয়াছে কি না জানিবার জন্য, কলিকাতা ও মফঃস্বলের কতিপয় কলেজ ও স্কুলের অধ্যাপক এবং সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের মতামত প্রার্থনা করায়, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে কুমার-রঞ্জনকে 'বিদ্যালয়ের সুপাঠ্য গ্রন্থ' বলিয়া আপনাদের অভিপ্রায়-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এ স্থলে উহা প্রকাশের স্থানাভাব। তাহার পর কলিকাতা

রাজকীয় পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচনী-সভা (টেক্‌ষ্ট-বুক-কমিটী) কর্ত্তৃক ইহা মধ্যশ্রেণী বঙ্গবিদ্যালয়ের (ছাত্রবৃত্তি স্কুলের) তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক বলিয়া স্থিরীকৃত, এবং ঐ সংবাদ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী সার্কেলের পাঠ্য-পুস্তকের তালিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

---

## ষষ্ঠ পুস্তক

# জীবনকুমার।

## ( স্বর্গ-ভ্রষ্ট-মানব-জীবন-লীলা। )

**পূর্ব্ব ভাগ; মূল্য এক টাকা।**

এই পুস্তকখানি পৌরাণিক বা প্রাচীন, করুণ-রস-প্রধান, কিন্তু বীভৎস ব্যতীত, কাব্যশাস্ত্রের সারভূত বীর, হাস্য, অদ্ভুত, শান্ত প্রভৃতি অন্য সকল রস-সমন্বিত, একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা উপলক্ষে লিখিত। আমাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, যদি কেহ ইহা অন্তরের সহিত মিলাইয়া পাঠ করেন, তবে তিনি বাস্তবিকই সুখী হইবেন; এবং অনেক প্রকার শিক্ষাও লাভ করিবেন। বস্তুতঃ প্রিয়নাথ উপন্যাস-চ্ছলে তাঁহার জীবনকুমার-সাহিত্যে বিশুদ্ধ অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় এমনই লিপিনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্থূলতঃ ইহা একাকীই কাব্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি নানারূপে বিশুদ্ধ বিভিন্ন-রস-প্রার্থী ব্যক্তিবর্গকে অন্ততঃ কিয়ৎকালের নিমিত্তও বিমোহিত করিতে সমর্থ। যিনি জীবনকুমার পড়িয়াছেন তিনিই ইহার প্রমাণ। আর ইহার মধ্যে যদি কোন সূক্ষ্ম বা অপার্থিব ভাবের সন্নিবেশ থাকে, সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণই তাহা ধারণার ও তজ্জনিত আনন্দ লাভের অধিকারী।

---

## সপ্তম পুস্তক

# জীবন্ত-পিতৃদায়।

## ( দুঃখীর ইতিহাস। )

### মূল্য বা ভিক্ষা দান—পাঠান্তে পাঠকের ইচ্ছাধীন।

ইহা একখানি নূতন প্রকারের পুস্তক। দেখা দূরে থাকুক, ইহা কেহ কখনও ভাবেন নাই যে, পিতার বর্ত্তমানে কোন পুত্রের জীবন্ত-পিতৃদায় হইতে পারে। ইহাতেও শ্রাদ্ধকরণানন্তর শুচি হইবার বাসনায় অশৌচ-গ্রহণ, উত্তরীয়-ধারণ এবং ( প্রতিমূর্ত্তি যোগে ) স্বারস্থ হওন পর্য্যন্ত আছে। ব্যাপার সম্পূর্ণ প্রকৃত, এমন কি গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিগণ-মধ্যে প্রায় সকলেই অদ্যাপি জীবিত। কেবল, বড়ই আক্ষেপের বিষয়! বর্ত্তমান ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৫এ বৈশাখ তারিখে প্রিয়নাথ, তাঁহার সাধের জীবন্ত-পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই, পিতৃদেবকে ইহলোক হইতে হারাইয়াছেন। মাতা অদ্যাপি জীবিতা, সুতরাং দায়িত্বের এখনও অভাব হয় নাই; পার্থিব কামনাও আছে।

"জীবন্ত-পিতৃদায়" সামাজিক উপন্যাসপ্রিয় পাঠকবর্গের জন্য মনোহর গল্পচ্ছলেই লিখিত। যাঁহার অণুমাত্রও সদাশয়তা ও পরদুঃখে সহানুভূতি আছে, ভিক্ষুক প্রিয়নাথের এই জীবন্ত-পিতৃদায়-রূপ হৃদয়বিদারিণী আখ্যায়িকা তাঁহার অবিরত অশ্রুধারা দর্শন না করিয়া ক্ষান্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। এই বিষাদপূর্ণ জীবন্ত-পিতৃদায়-কাণ্ড কেবল হৃদয়বান্ ও পরদুঃখ-কাতর ব্যক্তিবর্গের অবগতিনিমিত্ত অর্পণজন্যই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার মূল্য বা ভিক্ষা দান আদ্যান্ত পাঠের পর পাঠকের ইচ্ছাধীন। ডাকে পাঠাইতে হইলে মাশুল এক আনা লাগে।

প্রিয়নাথ-প্রণীত পুস্তক সকল, কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়-সমূহে পাওয়া যায়। আদিপ্রাপ্তিস্থান,—২২৫ নং অপার সারকিউলার রোড, "শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়", কলিকাতা। "জীবন্ত-পিতৃদায়" কেবল "শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়" হইতেই অর্পিত হয়। ইতি

শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশক।